Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 56–73
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

শতক্রতু পত্রিকার দু'জন গল্পকার : অনুবর্তন

জয়শ্রী ঘোষ
স্কুল শিক্ষিকা, পুলিন বিহারী নলিনী বিহারী দেব প্রাথমিক বিদ্যালয়
ই-মেইল : jaghs123@gmail.com

Keyword
শতক্রতু পত্রিকা, অনিশ, সাহিত্য অনীশ্বর, প্রতিস্রোত, সর্পিল, উন্মোচন, অঙ্গীকার

Abstract
বরাক উপত্যকার সাহিত্যে আধুনিকতার জোয়ার নিয়ে এসেছিল স্বপ্নিল, অতন্দ্রেরা কাব্যের জগতে, আর গদ্যের ক্ষেত্রে 'সম্ভার', 'অনিশ', 'শতক্রতু', 'সাহিত্য অনীশ্বর', 'প্রতিস্রোত', 'সর্পিল', 'উন্মোচন', 'অঙ্গীকার' প্রভৃতি।

বরাক উপত্যকার সাহিত্যের পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ ছোট পত্রিকাই ছিল কবিতা পত্রিকা। ১৯৫৭ সালের পূজোয় 'সম্ভার' পত্রিকার প্রকাশ ঘটিয়ে সম্পাদকদ্বয় অমিত কুমার নাগ ও অতীন্দ্রমোহন গুপ্ত কবিতার সঙ্গে গল্প, প্রবন্ধ চলচ্চিত্রকেও স্থান দিলেন। এ অঞ্চলে বাংলা ছোটো রচনার ইতিহাস মোটামুটিভাবে তখন থেকেই শুরু। শক্তিশালী তরুণ লেখকেরা 'সম্ভারে' বহুসংখ্যক গল্প লিখেছেন। তবে কোনো গল্প আন্দোলন 'সম্ভার'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। গোষ্ঠীচেতনা গড়ে তোলার কোনো প্রয়াসও সম্পাদকের ছিল না বললেই চলে। তবে কিছু কিছু গল্প ও গল্পকার উল্লেখের দাবি রাখেন।

শতক্রতুর বিভিন্ন সংখ্যায় বরাক উপত্যকার ইতিহাসকে যদি কেউ খুঁজে দেখতে চান, তাহলে তিনি হয়তো এক খণ্ড কালের নানা বৈশিষ্টের সঙ্গে পরিচিত হবেন। এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় যে লেখাগুলো ছাপা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে আসলে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মানুষের সম্পর্কের নকশি কাঁথার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্প তো অবশ্যই এই কাগজের প্রধান একমাত্র অ্যাজেণ্ডা ছিল, তবে কবিতা এবং প্রবন্ধের মধ্য দিয়েও 'শতক্রতু' ভিন্ন মেজাজের পরিচয় দিয়েছে।

ষাটের দশক পেরিয়ে শত্তরে এসে কিছুটা বিলম্বিত হয়েই বৃহত্তর বঙ্গ সাহিত্যের ছোঁয়া এসে লাগল বরাক উপত্যকায়। ষাটের প্রজন্মের মুখপত্র রূপেই আত্মপ্রকাশ ঘটল 'শতক্রতু'র। কতিপয় তরুণ গল্পকার মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ-মাধ্যম খুঁজে পেলেন এ অঞ্চলের ছোটো গল্পে। 'শতক্রতু'র প্রস্তাবনা সংখ্যায় শেখর দাশ, মিথিলেশ ভট্টাচার্য নূতন আঙ্গিকে চমকে দিলেন অভ্যস্ত পাঠক সমাজকে। শেখর দাশের 'ক্রমশ তাপ' গল্পটি উত্তাপ সৃষ্টি করল পাঠক মানসে। কেউ বা রেগে জ্বলে উঠলেন আবার কেউ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আশ্বস্ত হলেন-- না বরাক উপত্যকার গল্পে সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আজ আভাসিত হচ্ছে। কাছাড়ের আর দশটা সাহিত্য পত্রিকার মতো 'শতক্রতু' যথানিয়মে প্রথম সংখ্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি, কিছু ধরনের হৈ হৈ গদ্য পদ্য আর তুলকালাম কাণ্ড করতে করতে শতক্রতু এগিয়ে চললে কোমরে ধুতির বদলে গামছা কষেঃ। তাদের এই দুঃসাহস অদূর ভবিষ্যতে কাছাড়ে একটি সত্যিকারের সাহিত্য আন্দোলন গড়ে

তোলে। এমনি করে আটটি বছর কাটিয়ে দিল শতক্রতু শত দুঃখ কষ্টে অর্থের অনটনকে হৃদয়ে গোপন রেখে কেবলমাত্র তারুণ্যের আবেগে উন্মাদনায় নূতন অন্বেষণের অভিপ্রায়ে।

শতক্রতুর গল্পকাররা হলেন শেখর দাশ, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, তপোধীর ভট্টাচার্য, রণবীর পুরকায়স্থ, করুণাকান্তি দাশ, অনুশ্রী সেন, দিলীপ কুমার পাল, মিহির কান্তি রায়, শিবব্রত ভট্টাচার্য, অরিজিৎ চৌধুরী, আশুতোষ দাস, মৃন্ময় রায়, দুলাল ঘোষ, শিরীষ দে, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, আশিষ পুরকায়স্থ, জয়ন্তী বসু, সমরজিৎ সিনহা, অজিৎ কর, কৃষ্ণা মিশ্র, বিজয় দেবরায়, পীযূষ রাউত, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, মীনাক্ষী ঘোষ প্রমুখ।

'শতক্রতু' যে বাংলা গল্প রচনায় উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি রচনা করেছে, তারমূলে রয়েছে ভাষা ও ভাবের দূরন্ত আধুনিকতা এবং গল্প দেহসজ্জায় অর্থাৎ আঙ্গিকে বিচিত্র ও বহুমুখী পরীক্ষা নিরীক্ষা।

শেষ কথা তবুও বলতে হয়, আমাদের এ অঞ্চলের কবি, সাহিত্যিকদের অনেকটাই ছোটো পত্রিকার পাতায় বন্দী। 'ছোটো পত্রিকা' বা 'লিটিল ম্যাগাজিন' প্রকৃতপক্ষে বরাক উপত্যকার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার একমাত্র বিশল্যকরণী।' এই মৃত সঞ্জীবনী সুধা নিয়েই আজ আমরা বরাক উপত্যকার সাহিত্যের অমৃত রসমাধুর্যকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছি এবং রসসুধা আস্বাদনে প্রয়াসী হয়েছি। এখনও বরাক উপত্যকার সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার কিছুটা অনাবিস্কৃত এবং অনালোচিত রয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির বহু উপাদান এখনও পুঁথির পাতায় লুকিয়ে আছে। সে সমস্ত সোনার খনিতে খনন কার্য চালারার সময় আজ উপস্থিত।

Discussion

বরাক উপত্যকার বাংলা গল্পের ক্ষেত্রে 'অনিশ' একটা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল একথা সত্য। তবে নানা কারণে কিছুদিন পর প্রায় হঠাৎ অবলুপ্তি আন্দোলনে বাধ সাধল। সংঘবদ্ধ প্রয়াসে শৈল্পিক সংগ্রামকে জোরদার করতে গিয়েও কিছু কিছু মাত্রায় ব্যর্থ হল এ প্রয়াস। যাকে বলে বিদ্রোহ, যাকে বলে আন্দোলন প্রচলিত রীতি পদ্ধতি আঙ্গিকের বিরুদ্ধে, তা 'অনিশ' লক্ষ করা গেল না। একই মনন নিয়ে যে প্রতিবাদী সুর সাহিত্যিক নবতর পথে অভিযাত্রা করায় এবং যার ফলে আসে সাহিত্যে আধুনিকতা, তার বীজ 'অনিশে' উপ্ত হলেও ফল পেতে অপেক্ষা করে থাকতে হল সুদীর্ঘ পাঁচটি বছর অর্থাৎ কিনা 'শতক্রতু'র আবির্ভাব কাল পর্যন্ত।

১৯৭৩ অর্থাৎ ১৮৩০ সনের আষাঢ়ের রথযাত্রায় 'শতক্রতু'র আত্মপ্রকাশ। এ কোনো হঠাৎ আবির্ভাব নয়, পরিচিত পথ ধরেই 'অনিশে'র আবদ্ধ আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার জন্যে সম্পাদকদ্বয় মিথিলেশ ভট্টাচার্য ও ভাস্করানন্দ শর্মা ওরফে তপোধীর ভট্টাচার্য প্রাণের উদ্দীপনায় আর মনের তাগিদে 'শতক্রতু'র জন্ম দিলেন। শতক্রতু এ অঞ্চলের কথাসাহিত্যের জগতে ল্যান্ডমার্ক। বিশেষত বাংলা গল্পে নূতন শৈলী, আঙ্গিক প্রকরণে বহুবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা এ সমস্তই 'অনিশ' এ যার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল শতক্রতুতে এসে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। অনিশের শ্যামলেন্দু, মিথিলেশ, রণবীর ও অরিজিৎকে নয়ে শতক্রতু আবিষ্কার করল আরো কয়েকজন শক্তিমান লেখককে-অমলেন্দু ভট্টাচার্য, শেখর দাশ, বিজয় দেবরায়, আশুতোষ দাস, কৃষ্ণা মিশ্র, অনুশ্রী সেন তাদের অন্যতম।

১৩৮৮ অর্থাৎ ১৯৮১ পর্যন্ত শতক্রতু ২৫টি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। ২৬ তম সংখ্যাটি পরে প্রকাশিত হয় এবং এটিই সর্বশেষ সংখ্যা। ছোট পত্রিকার চরিত্র 'শতক্রতু' রক্ষা করে চলে ফলে কিছু কিছু অনিয়মিত প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সবই প্রকাশিত হয় 'শতক্রতু'তে, তবু গল্পের দিকে সম্পাদকদ্বয়ের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। ''ভাস্করানন্দ ওরফে তপোধীরই কেবল গল্প কবিতা সবই লিখতেন শতক্রতুর নিউক্লিয়াসে, বাকি যারা ছিলেন তারা প্রধানত গল্পকার।'' প্রথম বর্ষের ২য় এবং ৩য় সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয় ৪৮ পৃষ্ঠার ৬ টি গল্প নিয়ে। লিখেছিলেন শেখর দাশ, সমরজিৎ সিনহা, অরিজিৎ চৌধুরী, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, ভাস্করানন্দ শর্মা এবং মিথিলেশ ভট্টাচার্য। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল –

> ''কাছাড়ের চারিদিকে যখন তুলকালাম কবিতা আন্দোলন চলছে ঠিক সেই সময়ে গদ্য রচনার প্রতি এক ধরনের অহেতুক অনীহা কিম্বা পাশ কাটানো মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই সঙ্গে অক্ষমতার প্রশ্নও জড়িত

রয়েছে। তবে সে সময়ে এমন দু'একজন ক্ষমতাবান গদ্যকার যে ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু কবিতার প্রতি সীমাহীন দুর্বলতাই তাদের উৎকৃষ্ট গদ্য রচনার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এছাড়া অবশ্য আরো দু'চারজন কবিতা রচনার ফাঁকে ফোকরে কিছু কিছু গল্প লিখেছেন কিন্তু সে সব লেখা অত্যন্ত নীচুমানের যে লেখাগুলোকে আদৌ গল্প বলা যায় না। বলা যায় সাদামাটা বিবরণ। গদ্য রচনার জন্য যে নিবিড় অনুশীলনের প্রয়োজন, বোধ করি এ সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন না। তাই দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য গল্পকারের সন্ধান মেলেনি। ষাটের দশকের গোড়ায় দু'একজন তরুণ গল্পকার আত্মপ্রকাশ করলেন, যাদের লেখা পড়ে এটুকু বোঝা গেল আগামীতে কাছাড়ে উৎকৃষ্ট মানের গল্প রচনার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এই ফলশ্রুতি ধীরে ধীরে ফলবান হতে শুরু করল তখনই যখন আরো দু-চারজন বলিষ্ঠ তরুণ গল্পকার গল্পের আসরে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার নিদারুণ অভাবহেতু আজ পর্যন্ত কাছাড়ে একটি সুষ্ঠু শক্তিশালী গল্প আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারলো না।"[১]

এই উক্তি থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে 'শতক্রতু' সুষ্ঠু পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বাংলা গল্পে চাষকে ফলপ্রসূ করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। আর প্রতিভাবনান গল্প লিখিয়েদের খুঁজে নিয়ে তাঁদের দিয়ে গল্প লিখিয়েছে ০'শতক্রতু' তাঁদের ভাষায়- 'শতক্রতু'র আত্মপ্রকাশ কোনো আকস্মিক ঘটনা কিম্বা কোনো হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে নয়। অত্যন্ত জরুরি কারণেই শতক্রতু প্রকাশিত হল।

বরাক উপত্যকায় বাংলা গল্পচর্চার যে প্রচেষ্টা বিভিন্ন সময়ে চোখে পড়েছে, মূলত আশির দশক থেকেই এই ধারাকে এক ব্যতিক্রমী বহমানতার সাক্ষী হতে হয়েছে। অন্য ধারার গল্প পত্রিকা 'শতক্রতু'ই যে গল্পচর্চার ক্ষেত্রে এই নান্দনিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী একথা আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৩৮০ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৮৮ অব্দি, প্রধানত এই এক দশক জুড়েই 'শতক্রতু'র পাতায় বরাক উপত্যকার বাংলা ছোট গল্প এক নতুন পালা বদলের দিকে এগিয়েছিল। এই সময় পর্বে যাদের গল্প এই পত্রিকাটির পাতায় স্থান পেয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই স্বমহিমায় ভাস্বর। তবে 'শতক্রতু' পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকেই প্রধানত এই গল্পকারদের পথ চলা শুরু হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে যদি আমরা 'শতক্রতু'র সূচিপত্রগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে যে গল্পকারদের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে ভাস্করানন্দ শর্মা, শেখর দাশ, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, রণবীর পুরকায়স্থ, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, অরিজিৎ চৌধুরী, কৃষ্ণা মিশ্র, বিজয়দেব রায়, আশুতোষ দাস, স্বপ্না ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন। পরিসরের সীমাবদ্ধতার জন্য 'শতক্রতু'র পাতায় প্রকাশিত প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পগুলো নিয়েই আলোচনা করব। আমাদের বিশ্বাস, এই আলোচনা থেকে আশি দশকের বরাক উপত্যকায় বাংলা গল্পচর্চার প্রবণতাটিকে অন্তত চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

লেখক ভাস্করানন্দ শর্মার 'স্বপ্নের সীমানা ছুঁয়ে' (আষাঢ় ১৩৮০) গল্পটি রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ। গল্পটির নামের মধ্যেই একটি রোমান্টিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। গল্পের নায়ক পান্না কোহিমার নাগা পাহাড়ে অবসর বিনোদনের জন্য এসেছিল। পান্নাকে প্রথম থেকেই দেখা যায় এক অলসতাপূর্ণ জীবনের দিকে আকৃষ্ট হতে। সে যেন এক উদাসীনতার দোলায় আপন মনে দুলতে থাকে। বাস্তব জীবন থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায় সে। গল্পটির মধ্যে এমন অনেকগুলি সূত্রের টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায় যেখানে গল্পের নায়ক পান্না যেন স্বপ্নকেই আপন করে নিয়ে এক আলাদা জগতের বাসিন্দা হয়ে বসবাস করছিল। তার কাছে তার সহপাঠী, পরিবার-পরিজন সবই যেন এক বেমানান। যুবক পান্না নিজের খেয়ালী জগতে এতই মিশে আছে যে বাস্তবকে কল্পনার সাথে মিলিয়ে দিচ্ছে।

লেখক তার চরিত্রে এতই রোমান্টিকতা ভরে দিয়েছিলেন যে, পান্নার বেচ মেটে বিশ্বনাথ চাওদ্রীর কথা বলা, তার প্রতিটির প্রশ্নের উত্তর, এমনকি তার কোয়ার্টারে গিয়ে তাসের আড্ডায় জমতে তার যে বিরক্তি ও অস্বস্তি প্রকাশ পায় তা অগ্রাহ্য করা যায় না। সাধারণত যুবকদের যে রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়, একটু আড্ডা, একটু আমোদ, সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপচারিতা এর একটিও আমরা পান্নার চরিত্রে খুঁজে পাই না। সে যেন নিজের জন্য এক আলাদা জগৎ তৈরি করে নিয়েছিল। নায়ক পান্নার কাছে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই যেন এক অস্বস্তিকর পরিবেশে পরিণত। সে দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে আমরা বলতে পারি, তার মা-র তাকে খুঁজে না পেয়ে উদ্বিগ্ন হওয়াতে সে যে উত্তর করে তা এরকম-

"মাগো ভেবো না, আমার কিছুই করা হয়নি

আজ পর্যন্ত-মরব না এত শীগগির।''[২]

পান্নার এই হতাশাগ্রস্ত উত্তরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এক চিরকালের ক্ষুধার্ত আশা ভগ্ন হৃদয়ের চিৎকার। এক বেদনার্ত জীবনের কিছু পাওয়ার ব্যাকুল আবেদন। কিন্তু সেই আবেদন যে সে কার কাছে রাখছে তার চাওয়া, পাওয়া ও পিপাসা কিভাবে মিটবে তা সে জানে না। শুধু যেন এক হাড়-মাংস পূর্ণ শরীরের নিয়ে প্রতিদিন কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বের হয় কখনো কুয়াশার ভিরে আবার কখনো লতিয়ে যাওয়া আঁকা-বাঁকা রাস্তার গায়ে। তার কাছে কোহিমার পাহাড়গুলোই যেন আপন মনে হয়। তাদের কাছে সে তার মনের গোপনে রাখা প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে। তাদের সাতে কথা বলে। সে বাস্তব জীবন থেকে নিজেকে এতই আড়াল করে রেখেছিল যে তাপশ ও মিথিলেশের চিঠিরও কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই মিথিলেশের চিঠির উদ্দেশ্যে সে বলে উঠে 'শ্লা গঙ্গাফড়িঙ কোথাকার'।

গল্পের প্রথম থেকে পান্নাকে বাস্তব জীবনের প্রতি যতই নিরাসক্ত দেখা যায় না কেন কিন্তু তার ভিতরেও যে খাওয়ার ইচ্ছা জাগরিত হতে দেখা যায় না বা কেন কিন্তু তার ভিতরেও যে শান্তা নামে এক কিশোরীর চোখে, চিবুকে ঠোঁটে চুমু খাওয়ার ইচ্ছা জাগরিত হতে দেখা যায় বা শান্তাকে স্বপ্ন দেখে, 'তুমি আজ আমার নামে বালিশটা একটু উল্টে দিয়ো', এ ধরনের রোমান্টিক ভাবনা চিন্তার যে প্রকাশ পাওয়া যায় সে দিক থেকে গল্পকারের অনবদ্যতা অস্বীকার করা যায় না। গল্পের নায়ক পান্নাকে গল্পকার এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে তার সঙ্গেই গল্পের সমস্ত টানাপোড়েন জড়িয়ে ছিল। আর যে লোকের মধ্যে রোমান্টিকতার বিপুল আভাস লক্ষ্য করি সে দিক থেকে 'রিয়্যালি ইউ আর ষ্টিল ওল্ড মডেল' এই উক্তিটিকেও এক বাক্যে স্বীকার করা যায় না। পান্না যদিও তার চাওয়া-পাওয়ার হিসাব খুঁজে পেয়েছিল তার শানুয়ার কাছে কিন্তু সেখানেও সে অপারক প্রমাণিত হল। বিকেলবেলা কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে কিশোরী শানুয়ার কাছে গিয়ে সে তার হৃদয়ের যন্ত্রণা, অস্বস্তি, কিছু পাওয়ার যে ইচ্ছা তা ব্যক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু শান্তার ঘরে বসা তাসের আড্ডার সাহেব, বিবি, গোলামেরা পান্নার দিকে ঠাণ্ডা নিয়ে, তেড়ে আসে, সাহেব, বিবি, গোলাম, টেক্কা সবই যেন এক প্রচন্ড, হুলস্থূল অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে যে শানুয়ার কাছে গিয়ে পান্নার তার জীবনের চরম পরিণতি খুঁজে পেতে চেয়েছিল সেখানেও সে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মুখোমুখি হয়। তাহলে কি সেই অস্বস্তিই ছিল পান্নার জীবনের চরম পরিণতি, যার দরুন সে জীবনের নৈসর্গিক প্রেমকেও উপভোগ করতে পারেনি যাকে নিয়ে সে এত কল্পনার জগতে ঘিরে থাকত তাকেও তার হৃদয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সক্ষম হয়নি এবং যে কুয়াশামগ্ন নিবিড় অন্ধকারকে সে ঘিরে থাকত, যে পাহাড়ের বুকে ঘুরে ঘুরে তার সমস্ত দিন কেটে যেত শেষ পর্যন্ত সেখানেই তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেল।

গল্পকার 'জীবনাযাপন' (অক্টোবর ১৯৭৮) গল্পটিতে প্রধান চরিত্র যুধিষ্ঠির চন্দ্র দাসের মাধ্যমে আমাদের যে জীবন সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন তা সত্যই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। উনত্রিশ বছর বয়সী যুধিষ্ঠির চন্দ্রকে এই গল্পে দেখতে পাই দুধরনের জীবন যাপন করতে। এই দুধরনের জীবনের মধ্যে একদিকে তাকে দেখা যায় গাড়ীর কলকব্জার গন্ডগোল বের করতে ব্যস্ত। কারখানা ঘরেই যেন তার জীবন সীমা সমাপ্ত। যেভাবে ডাক্তার রোগীর নাড়ী স্পর্শ করেই বুঝতে পারেন যে রোগীর কি অসুখ বা কি অসুবিধে হয়েছে ঠিক সেভাবে যুধুবাবুও বনেট খুলে এক পলক তাকিয়েই বলতে পারেন গাড়ির কোথায় কি গলদ। গাড়িকে সে তার আবোলা বন্ধু-বান্ধব বলে মনে করে যাদের সঙ্গে সে তার মায়ের মতন কথা বলিতে থাকে। এক স্নেহ-পরায়ণ নারীর মমতাময়ী ছাপ যুধুবাবুর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আদুরে গলায় ওদের আশ্বাস দেয়, ভরসা দেয়। তাদের বলতে থাকে-

> ''আমি তোমাদেল ভালবাতি। নখখী তোনালা, থিক হয়ে যাবে।
> এইতো আমি আচি। এইতো। লাগ কলে না কেমন।
> কত ভাল খকিল এনো দোব। খুউব ফুততি পাবে।
> মানিক আমাল, তোনা আমাল, লাগ কলে না, ছিঃ।''[৩]

কারখানার গন্ডীতেই সে তার জীবনের সমস্ত আনন্দ বেদনা, চাওয়া পাওয়া সব খুঁজে পায়। কারখানার মোটর, লড়ীগুলি যেন তাকে ছায়া প্রদান করতে থাকে যাদের নিচে কাজ করতে করতে হঠাৎ শুয়ে পড়ে। এবং স্বস্তি খুঁজে পায়।

গল্পকার যুধিষ্ঠিরের কারখানার জীবনযাপনকে শুয়োরের বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে সেটাই করেনি বলে আরো পাঁচজনের মতো সে চলাফেরা করতে পারেনি যা জীবনের প্রকৃত স্বাদ কোথায় তা সে যাচাই করতে পারেনি।

এক্ষেত্রে জীবন তার কাছে এক জটিলতাময় ঘেরাটোপে পরিণত। কিন্তু জটিলতাপূর্ম জীবন আর সুখ স্বাচ্ছন্দে ভরা জীবনের পার্থক্য কী জানত যুধিষ্ঠির চন্দ্র। তারও কি ইচ্ছে হত এক আড়ম্বর পূর্ণ জীবন যাপন করতে সে তো আপন মনে কারখানার জগৎকেই তার স্বপ্নের রাজ্য বলে মেনে নিয়েছিল। আর কলুর বলদের মত গিরিধারী সিংহকে সেই স্বপ্নের রাজ্যের রাজা বলে কিন্তু, গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এক অন্য ধরনের যুধিষ্ঠির চন্দ্রকে দেখতে পাই। মুখের দুপাশ দিয়ে যে ব্যক্তিটির ঘুমানোর পরেই লালা ঝরতে থাকে, তার মাথায় এবরো খেবরো চুল, মাথার একপাশে টাক, এরকম শারীরিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিটির কথা শুনা মাত্র আমাদের মনে তার যে ছবি ফুটে ওঠে তাতে মনে হয় এক অস্তিত্বহীন, নাম গোত্রহীন অস্থি কঙ্কাল স্বরূপ মানুষ। যে নাকি জীবন সম্পর্কে অচেতন। কিন্তু তার এই অচেতন জীবনের পিছনেও যে এক সচেতন জীবন নাড়া দিচ্ছে তা আমরা দেখতে পাই তার মা এর প্রতি তার যে কর্তব্য যে চিন্তা ভাবনা সে জ্ঞাপন করে তা দেখলে তাকে কারখানার জগতের যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনা করা যায় না। সম্পূর্ণ এক আলাদা ব্যক্তিত্ব। যে যুধিষ্ঠিরকে আমরা কারখানার জগতে নিজের প্রতি, এই সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে এক টালমাটাল জীবন যাপিত করতে দেখি ঠিক অপর দিকে নিজের বয়স বাড়া নিয়ে চিন্তা এমনকি মায়ের বয়স বাড়ার জন্য সে আর যে মায়ের হাতের ভাল মন্দ রান্না আর খেতে পারবে না এরকম চিন্তা একমাত্র একজন বাস্তব জীবনের বাসিন্দারই থাকতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

যে ব্যক্তি এক টুকরো জমিতে নানা রকমের ফসল ফলানোর স্বপ্ন দেখে, 'সাত-ভাই চম্পা জাগরে' এ ধরনের গান গুন গুন করতে থাকে, কালো ঘোড়ার খুরের শব্দে চকিত হয়, মেঘের গুরু গর্জনে যার হৃদয় কাঁপতে থাকে, যার পচে যাওয়া মাথার এক কোনে হঠাৎ করে যে 'গাঁ, গেরাম, পুকুর আর মেয়ে মানুষের ছবি উঁকি দেয়-এই ধরনের বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিকে কি কেউ ছন্নছাড়া বা ছন্নমতি বলে মনে হয়। জীবন সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তির প্রকৃত ধারণা না থাকত তাহলে কি তার মনে ফসল ফলানো বা চম্পাকে ঘুম থেকে জাগানোর মতো গানের উদ্রেক হত? গল্পের প্রথম পর্যায়ে যে ব্যক্তিকে বারবার কাজ করতে গিয়ে যেখানে সেখানে ঘুমানোর জন্য শুয়োরের বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সেই ব্যক্তিই কি কাউকে গানের মাধ্যমে ঘুম থেকে জাগানোর প্রয়াস করতে পারে? গল্পের এই মোড়ে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন গল্পকার পাঠকের সামনে তার লেখনীতে তুলে ধরেছেন।

গল্পের প্রথম পর্যায়ে জীবনকে একঘয়ে মনে করে বাঁচতে শেখা এক পুরুষ আবার ঠিক তারই পাশাপাশি অপর পর্যায়ে সে জীবনের মধ্যে যে অনেক নতুনত্ব লুকিয়ে আছে এবং সেই নতুনত্বকে বাস্তবে পরিণত করতে উৎসাহী এক অন্য পুরুষকে লেখক পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। তাহলে এই দুরধরনের জীবন সত্যের মধ্যে যুধিষ্ঠির চন্দ্রের যে দ্বন্দ্ব বা যে টানা-পোড়েন তাকে বাস্তবায়িত করে নতুন রূপ দেওয়ার একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে পাঠক মহলের।

'ধীরাজের গল্প' (কার্তিক ১৩৮০) রচনাটির সমস্ত টানাপোড়েন এক হাসপাতালকে কেন্দ্র করে। গল্পের প্রধান চরিত্র ধীরাজের জীবনের যে করুণ পরিণতি লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা সত্যই মর্মান্তিক। একটি তেইশ বছরের যুবকের যে জীবনরেখা লেখক তার লেখনীতে তুলে ধরেছেন তা সত্যই আমাদের হৃদয়কে ভেঙ্গে চুরমাড় করে দেয়। ধীরুর যে বয়সের উল্লেখ লেখক তাঁর রচনায় করেছেন সেই বয়সে একজন যুবকের দৈনন্দিন কাজকর্ম বা চলাফেরা যেরকম হওয়া উচিত ছিল এখানে সব তার উল্টো। নিজের জীবনের প্রতি উদাসীন, নিজের দায়িত্ব কর্তব্য থেকে বিমুখ, এমনকি পৃথিবীতে যে ব্যক্তিত্বের আর কোন কিছুর সাথে তুলনা করাই বৃথা বা অনর্থক সেই মাকেও সে তার মনের দ্বন্দ্বের কথা বলতে পারছে না। শুধু যে এক করুণ আক্ষেপের চিৎকার সে তার মনের মধ্যে বিঁধে রেখেছে, 'মা, মাগো', এই মনে হচ্ছে সংসারের কোন কিছুকেই সে খোলা মনে বরণ করতে পারছে না। তার কাছে সব কিছুই এক প্রতিবাদ স্বরূপ। সব কিছুই যেন বেরঙ হয়ে যায় তার দৃষ্টিতে। কেননা বেহালার কথা শুনে সে বলে উঠে-'নো মোর প্লেয়িং অন ভায়োলিন'। কেন এই তরুণের মনের এই বিষাদ রূপ। যে বয়সে যুবক-যুবতীদের জীবনের বেশিক্ষণ সময়ই কেটে যায় আপন জগৎ নিয়ে চিন্তা চেতনায়। বাস্তবের সব আবরণকে একেবারে নিজের মুষ্ঠিবদ্ধ করার আকাঙ্খায়। সেখানে কেন নায়ক ধীরু নিজের বাস্তব জগৎ থেকে সরে গিয়ে নিজের জন্য এক আলাদা জগতের তৈরি করে নিয়েছে। এবং সেই স্বপ্নালু জগতকেই আপন করে নিয়েছে।

ধীরাজের মধ্যে আমরা এক রোমান্টিক প্রেমিক সত্তার পরিচয় পাই। সে সত্তা তাকে বাস্তব থেকে কল্পনার ঘেরাটোপে বন্দী করে রেখেছে। আর যখনই সে সেই ঘেরাটোপ থেকে বের হয়ে আসল সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায় তখনই তাকে তার স্বাপ্নালু জগৎ আর প্রকৃত বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হতে দেয়নি।

'চারিদিকে বুদ্বুদ, চারিদিকে মিত্রা, চারিদিকে বুলভুলাইয়া"[৪]

গল্পকার গল্পের নায়িকা মিত্রাকে প্রকাশ্যে না এনেও ধীরাজের ভাবনা-চিন্তায় এমনভাবে বাস্তবায়িত করে রেখেছিলেন যাতে মিত্রাকেই গল্পের মেরুদন্ড বলে মনে হয়। যে মিত্রাই ছিল ধীরুর মনের গভীরতায়। কিন্তু সে তার ভিতরের যন্ত্রণাকে তার সহপাঠী, পরিবার-পরিজন এমনকি তার মায়ের কাছে পর্যন্ত ব্যক্ত করতে পারেনি। তার ভিতরের যন্ত্রণা যেন এক প্রতিবাদের, বিরোধের এবং কেড়ে নেওয়ার লোলুপ ভঙিমায় ফুটে উঠেছিল। আমরা তার পরিচয় পাই ধীরুর ছোট ভাইয়ের খেলনা ধরা মাত্রই সে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী অন্য পাঁচটা শিশুর মতই চিৎকার করে উঠে। কিন্তু ধীরাজের দৃষ্টিতে সেটা ছিল এক প্রতিবাদস্বরূপ। সে যেন সবকিছুতেই এক অসহ্য অস্বস্তি অনুভব করে।

মিত্রার চোখ দিয়ে ধীরাজ যে জগতের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেই আলৌকিক মায়া জগতের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিল ধীরাজ। কিন্তু যখনই মায়ার ঘোর কেটে বাস্তবের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল ঠিক তখনই সে এক অন্ধকারে আচ্ছন্ন পথের পথিক হয়ে রইল চিরকালের জন্য। ঘুমের ঘোর থেকে উঠে সে জানতে পারল তার প্রিয়তমা আর তার কাছে নেই সে এখনও চেরাপুঞ্জীর হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে।

'আয়না' (আষাঢ় ১৩৮১) মানুষের মনের প্রতিচ্ছবির সঙ্গে আয়নাকে তুলনা করা হয়েছে আয়না গল্পটিতে। যখন আমাদের মনের যন্ত্রণা, ক্ষোভ, বেদনা ইত্যাদি কারোর সঙ্গে ব্যক্ত করতে পারি না তখন সে আয়নাকে তার প্রতিনিধি বা অন্তরঙ্গ মনে করি সবকিছুই বিনা দ্বিধায় ব্যক্ত করতে থাকি। এই গল্পটিতে গল্পকার আয়নাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে গল্পের মূল বক্তব্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। গল্পের নববধূ বীথি তার জীবনের জটিলতাপূর্ণ অংশটিকে, যে অংশটি তাকে এক বিষাক্ত পোকার মতো কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল এবং তার জীবনটিকে এক শব্দহীন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই অংশটিকে বীথি এক জড় বস্ত আয়নার সামনে তুলে ধরে জড় বস্তুটির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেছিল। এক প্রশ্নচিহ্ন রেখেছিল আয়নাটির গায়ে। এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেরও আশা রাখত আয়নার কাছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত 'সুভা' গল্পের নায়িকা সুভার জীবনের করুণ কাহিনীকে তুলনা করতে পারি। পুরো নাম সুভাষিণী হলেও জন্মসূত্রে সে বোবা। বিধার নিষ্ঠুর নিয়তিকে সুভা তার প্রকৃত সত্য বলে মেনে নিয়েছিল ঠিক যেভাবে বীথিকে তার বাবা পার্থ-র সঙ্গে তার ভালোবাসার কথা জেনে পিসেমশাইয়ের বাগান বাড়ি থেকে অন্য শহরে নিয়ে গিয়ে ঘরবন্দী করে প্রণবের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। এক বন্দী আসামীর মতো। তখন বীথিও মনের মধ্যে সমুদ্রের সহস্র ঢেউ এর মতো সহস্রটি প্রশ্নের উদ্রেক থাকা সত্ত্বে প্রণবকেই তার নিয়তি বলে মনে নিয়েছিল।

বীথি যেভাবে তার সেই সহস্রটা প্রশ্নের উত্তর কুঁজে বেড়ায় আয়নার কাছে ঠিক সেইভাবে সুভাও তার জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনাকে 'প্রকৃতি'র সঙ্গে বাটতে থাকে। প্রকৃতিকেই সে পরম আত্মীয় বলে মেনে নেয়। কেননা 'প্রকৃতি ও বোবা আর সুভাও বোবা'। নির্জন দুপুর যেন সুভাকে প্রতিদিন এক নতুন সোনালী আভার বশীভূত করে দেয়। যে আভা সুভাকে সঙ্গ দান করে। ঠিক যখন বার্থ বীথিকে একা রেখে অফিসের চলে যায় ও বাড়ির সকলে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বীথি একাকীত্বে ভোগে ও তার কাছে চার দেওয়ালের ঘরটি যখন এক অন্ধকারময় খাঁচায় পরিণত হয় তখনই সেই আয়নাটিই বীথির প্রকৃত বান্ধবে পরিণত হয় ও বীথির একাকীত্বের সঙ্গী হয়ে উঠে। যার কাছে তার মনের অসহ্য যন্ত্রণাকে স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এক অপূর্ব মহিমায় সুভার জীবনের নির্মম ঘটনাকে প্রকৃতির সাহায্যে মহিমামন্ডিত করে তুলেছেন ঠিক সেইভাবে গল্পকার ভাস্করানন্দ শর্মা বীথির জীবনের সব থেকে বড় দ্বন্দ্ব যেখানে বীথি যেখানে বীথি পার্থের কামনাকে ভালোবাসার নাম দিয়ে ভুলতে পারছিল না সে জায়গায় প্রণব বীথির স্বামী হওয়া সত্বেও তার কামনা প্রিয়তাকে

মন থেকে গ্রহণ করতে পারছিল না। প্রতিদিন যেন এক অস্বস্তিকর জগতের সঙ্গে বীথির পরিচয় হচ্ছিল। একটি বিরাট প্রশ্নচিহ্ন রেখে গিয়েছিল বীথি আয়নাটির কাছে যে-

"এখন কিভাবে যাবে দিন? এভাবেই কী যাবে!"[৫]

'ভয়' (মাঘ ১৩৮১) গল্পটিতে গল্পকার প্রধান চরিত্র নিখিলের মনে যে ভয়ের সঞ্চার করেছেন বাস্তবেও কি তার কোন অস্তিত্ব ছিল না কি সেটা তার মনেরই কোন দ্বন্দ্ব। এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন সমস্ত গল্পটিকে ঘিরে রেখেছে। সমস্ত গল্পটিতেই কোন এক নাম না জানা ভয়ঙ্কর ব্যথা নিখিলকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল। কিন্তু নিখিল যে ব্যথার কথা বারবার সকলকে বলেছিল সেই ব্যথা সম্পর্কে সেও কি পুরোপুরি একমত ছিল? আদৌ কি কোন ব্যথা তার অন্তর মনকে শেষ করে দিচ্ছিল? কেননা আপিসের শিবদাস বাবুর উপদেশ "অন্য কিছু কমপ্লেন নাকি?" ডাক্তার দেখান মশাই, ডাক্তার দেখান-সময় বড়ো খারাপ"-এই কথাগুলো শুনে তার উদ্দেশ্যে নানান বিচ্ছিরী মন্তব্য করে নিখিল যে,

"...এ সমস্ত বোরিং পাবলিককে পোঁদের কাপড় তুলে আচ্ছা করে ছ্যাঁকা দিতে হয়।"[৬]

আমরা পাঠকগণের কাছে গল্পকারের নিখিলের মুখ দিয়ে এমন অপ্রীতিকর উচ্চারণ করানো সঠিক বলে মনে হল না। কারণ এই উচ্চরাণের মধ্যে কোথায় অস্পষ্ট রয়ে গেছে নিখিলের সেই অর্থহীন ভয়ের উদ্রেক। যদি গল্পের নায়ক নিজের ভয় সম্বন্ধে পুরোপুরিভাবে এক কথায় অটল থাকত তাহলে তার মুখে এরকম বক্তব্য অর্থহীন বলে মনে হত না। কেননা নায়ক নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না যে সত্যই কি তার বুকের ভেতরে কোন ব্যথার সৃষ্টি হয়েছে না কি সেটা তার কাল্পনিক মনের কোন গুজব। আর এরকম যদি না-ই-বা হত তবে সে শিবদাস বাবুর উপদেশকে স্বান্তনা বলে ভেবে নিত না কি যাচ্ছে তাই শ্লা, সিমপ্যাথি। কেন নিখিল শিবদাস বাবুর উপদেশে এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল? এখানে রয়ে গেছে এক প্রশ্নচিহ্ন।

এমনকি গল্পের প্রথমেও দেখতে পাই, নিখিলের বাবা গল্প বলতে বলতে হঠাৎ নিখিলকে যখন জিজ্ঞাসা করতেন- 'কী করে খোকা ভয় পাচ্ছিল?' নিখিল তখন সেই ভয়ের তীব্র প্রতিবাদ করে বলত 'না'। আরো বলত তার কাছে একটা তরোয়াল আছে যা দিয়ে সে 'ভয়'কে তাড়িয়ে দেবে। এখানে গল্পকার একটা প্রশ্নচিহ্ন রেখে গেছেন, যদি ভয় না-ই পায় তবে 'তাড়ানোর' ব্যাপার আসবে কেন? সুতরাং গল্পকার গল্পটিতে প্রধান চরিত্রকে আমাদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন সে নাকি তার মনের এই দোলাচলতাকে কোথাও একবাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছে আবার কোথাও তার প্রত্যাখান করছে। নিখিলের এই জীবনের প্রতি নিরাশাময় উচ্চারণে সে যে মৃত্যুকে তার একেবারে নিকটে বলে ভেবেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার অপর দিকে দেখা যায়, নিখিল যখন ডাক্তারের কাছে তার ব্যথা উপশমের জন্য সাক্ষাৎ করতে যায় তখন ডাক্তারের-"ওসব কিস্যু না, আপনি বোধ হয় কোনোদিন চোট পেয়েছিলেন, তাই একটু আধটু মাসকুলার পেইন হয়েছে, বুঝলেন! ওটা এমনিতে সেরে যাবে-!" ডাক্তারের মুখে এরকম একটা ইতিবাচক উত্তর শোনার পরও নিখিল তা সরলতার সহিত মেনে নিতে পারছিল না কেন, কেন সে এক জটিলতাময় অন্ধকারের ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে গিয়েছিল।

'সেই বাড়ি' (চৈত্র ১৩৮১) আমরা সবই সুন্দরের পূজারী। পরিপূর্ণতাকে আমরা আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলে মনে করি। যখন পরিপূর্ণতায় সব কিছু ছেয়ে যায় তখনই তা আমরা সাধারণ মানুষের কাছে এক আলৌকিক সৌন্দর্যতায় ভরে উঠে। গল্পকার ভাস্করানন্দ শর্মা 'সেই বাড়ি' গল্পটিতে বাড়ির দুটি রূপের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করাতে চেয়েছেন। গল্পের প্রথম স্তরে বাড়িটির আমরা এক জীবন্ত রূপ দেখতে পাই। সেই জীবন্ত রূপের সাক্ষী স্বরূপ আকাশময় আবিরগোলা রঙ ছড়ানো সূর্য, শিশুর মুখে মায়ের স্তন চাপানো দৃশ্য, বাঁশীর শব্দ, হরিণ ও খরগোশের নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করা এ সবকিছুর মধ্যেই যেন এক নতুন জীবনের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। নতুন জীবন, নতুন প্রাণ সব কিছুতেই যেন এক নতুনত্বের ছাপ কিন্তু বাড়িটা পুরোনো অনেক পুরোনো'। বাড়িটা পুরোনো হলেও তার চারপাশে ঘিরে যে সকল নতুন নতুন জীবনের সমাবেশ গল্পকার তার রচনায় তুলে ধরেছেন তা সত্যিই পাঠকগণের হৃদয়কে জীবন সম্পর্কে আরও আগ্রহী করে তুলে।

কিন্তু হঠাৎ সেই 'পুরোনো বাড়িটা সত্যই পুরোনো হয়ে গেল। এক শ্মশানে পরিণত হল সেই বাড়ির অস্তিত্ব। যেখানে হাট বসত, নানা লোকের সমাগম হত সেখানে হঠাৎ বুড়ো রাখাল চোখে ছানি আর জল পিচুটি নিয়ে ঝাপসা দৃষ্টিতে

মাঝে মধ্যে এসে জমি মাপা দেখে। এখানে বুড়ো রাখাল, উই ধরা বাঁশি, রুগ্ন শাল-সরল তমালের সঙ্গে সেই বাড়ির অস্তিত্বকে তুলনা করেছেন গল্পকার। ভগ্ন প্রায় দরজা-জানালা। যেন সবদিকেই এক বাঁচার আর্তনাদ। এখন কেউ আর কারোর কথা ভাবে না। সবই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

সেই বাড়িটিকে গল্পকার নতুন ভঙ্গিমায় এক আলৌকিক জগতের মহারাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন যাকে কেউ কোনদিন দেখেনি। এবং সেই বাড়িটিকে ঘিরে সাধারণ কৃষক মজুরেরা যে স্বস্তি পেত তার কেন্দ্রমূলে ছিলেন রূপকথার কাহিনীর রাজকুমারের মতো এক ব্যক্তিত্ব যে নাকি সাত-সমুদ্র পার থেকেও গল্পের রাজকন্যাকে রাক্ষশ খোক্ষসের হাত থেকে রক্ষা করে আনতে পারে। এ প্রসঙ্গে গল্পকারের মনে পড়ে-'তাদের পেটে ক্ষুধা মুখে হাসি।' এই হাসির পেছনে যে প্রগাঢ় বিশ্বাস বা আশা তা সত্যিই গল্পটিকে এক অন্য পথে নিয়ে যায়। এখানে মহারাজকে যে রূপকথার রাজকুমারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তার কারণ মহারাজ স্বপ্নালোকে বাস করেও সেই দুঃখী ভিখরী ও ছিন্নমূল মানুষের দাতা রূপে কাজ করে গেছেন। তাই পেটে ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও তাদের মুখে তিনি হাসি ফুটাতে পেরেছেন।

কিন্তু আজ আর কেউ ক্ষুধা পেটে হাসি মুখ নিয়ে এই বাড়ির দিকে আসে না। আসা তো দূরের কথা এমনকি তাকাতেও ভয় করে।বাড়িটি যেন কারো সঙ্গ খুঁজে বেড়ায়। এক অসহায় বেদনায় চিৎকার করে উঠে দরজার বিচ্ছিরি ক্যাঁ-চ আওয়াজটির মতো। এখন আর বাড়ির শোভা বর্দ্ধিত হয় না। কোন হাঁক-ডাক, দীয়তাং, ভূজ্যতাং কিছুরই কোন শব্দ শোনা যায় না। কেবল সেটাই অনুভব করা যায় যেভাবে মরুভূমিতে কোন পথিক হাঁটতেই হাঁতে মারিচিকাকে জল মনে করে সেখানে ছুটে যায় এবং এক ভীষণ হতাশার সম্মুখীন হয় ঠিক সেইভাবে বাড়িটিও যেন তার সঙ্গিনীকে খুঁজে বেড়ায় ও এক শব্দহীন যন্ত্রণায় ভোগে।

পরিশেষে এটাই বলতে পারি, 'সেই বাড়ি' গল্পটিকে আমরা মানুষের জীবনের যে তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দুটি পর্যায় যৌবনকাল ও বৃদ্ধকালের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কেননা যৌবনকালই হচ্ছে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। এই সময়েই মানুষ তার জীবনের সমস্ত চাওয়া, পাওয়া, নিজেকে প্রকৃত মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করা সব কিছুই অর্জন করতে পারে। ঠিক যেভাবে সেই বাড়িটির চৌহদ্দিতে সব কিছুর পরিপূর্ণতা এমনভাবে ছিল যাতে হাত বাড়ালেই এক রাশ সুখের আলোয় হাতের মুঠো ভরে যেত। কিন্তু বৃদ্ধকাল মানুষের জীবনের এমন একটা সময় যে সময়ে মানুষ চায় তার চাওয়া, পাওয়া ও যা সে অর্জন করে রেখেছে সব কিছুর মধ্যে দিয়েই তার বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দেয় কিন্তু যখন সে তার সেই পাওনা থেকে বিরত থাকে তখন তার সমস্ত আশা নিরাশায় পরিণত হয়। এক নিরাশাগ্রস্ত জীবনের দিকে ধাবিত হতে থাকে তার সোনালী রং মাখা সেই দিনগুলো। এখানে সেই বাড়িটিও তার পরিপূর্ণতার ডালিকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। এক মৃত্যুমুখে পতিত যাত্রীর মতো শুধু চোখ খুলে এই ভগ্নতার দৃশ্য দেখতে থাকে কিন্তু হাড় ভাঙ্গা বুড়োর মতো কিছু বলতে পারেনি। কারণ তখন যৌবন কালের বিশ্বাস আর বৃদ্ধকালের বিশ্বাসের মধ্যে এক বিস্তর ফারাক জন্মে যায়।

শতক্রতুর অন্য কুশল সেনানী শেখর দাস। এই পত্রিকার চরিত্র অর্জেন তাঁর গল্পগুলি বিশেষ মর্যাদাবাহী।
ব্যাষ্টি মানুষের আত্মক্ষয়, বিবমিষা, আবার আশ্রয়ের সন্ধানই যেন 'ক্রমশ তাপ' (আষাঢ় ১৩৮০) গল্পটির মূল বিষয়। সল্পায়তন গল্পটির সম্পূর্ণ অবয়ব জুড়েই মিশে আছে এক মন্থর ক্ষয়, যা একই সঙ্গে তীব্র। হিলুর নিঃসঙ্গতা, হিলুর অসুখ বিসুখ, হিলুর আত্মকথন, হিলুর সংলগ্নতা অথবা সংলগ্নহীনতা ইত্যাদি সবই আসলে আধুনিক নাগরিক জীবনের নানা অবক্ষেয়ের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। জ্বর হলেই হিলু যেন তীব্র আত্মক্ষেয়ের সম্মুখীন হয়। সুধা কখনও, কখনও ছোরদিকে কেন্দ্র করে হিলুর অবিশ্বাসের আভাস পাই আমরা। এক অব্যাখ্যাত তাপই যেন আমাদের জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। নাগরিক জীবনের ক্রম অবক্ষয়ের বিপরীতে এই ক্রমশ তাপ।

'শ্বেত রক্ত কণা' (ভাদ্র ১৩৮০) গল্পটিতে বিবর্ণতা, বেরঙ মনোভাব, সবকিছুই যেন ঘন কুয়াশায় লুকিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কোন কিছুকে নিজের আয়ত্তে ধরে রাখা যাচ্ছে না। সর্বত্রই যেন এক জরাজীর্ণ অবস্থা, এক ভগ্ন দশা। যে ভগ্নতা ছাড়খার করে দিচ্ছিল ড্রাইভারকে। তার সবকিছুতেই যেন এক হিসেবে। কীসের হিসেব হয়ত সে নিজেই সে বিষয়ে ভাল করে অবগত নয়। সবকিছুই যেন উড়ে যাচ্ছিল। ঠিক যেভাবে বলাকা আকাশে উড়তে উড়তে এক নাম না জানা ঠিকানায় বিলীন হয়ে যায়। চেষ্টা করছিল এসবের মধ্যেও শিব রাত্রির সলতের মতো একটু কিছু ধরে রাখতে। মানে

একটু বাঁচার ইচ্ছে। যে ইচ্ছেটা প্রকাশ পায় গাড়িটিকে যেভাবে ড্রাইভার যত্নের সহিত পরিচর্যা করছিল তাতে একটি আশাবাদী ব্যক্তি সত্তার পরিচয় পাই। আশাবাদী হলেও সেই আশা বর্ণহীন তাতে কোন আমোদ নেই, একেবারে 'সাদা রক্ত কণার মতো'। লেখক নামটির মধ্যেই এক দ্যোতনাময় ব্যঞ্জনাকে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন। কচি ঘাসের যেভাবে পা রাখতে শরীর নির্জরে উঠে ঠিক সেভাবে 'সাদা রক্তদানার আশে পাশের রেডিয়েটারের নরম অংশ ওর আটকায়।

গাড়ি ও ড্রাইভার একে অপরের পরিপূরক এই চরম সত্য সম্পর্কে আমরা অবগত। কিন্তু এখানে এই চরম সত্যকে লেখক আমাদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে একে অপরের পরিপূরক এর চাইতে বেশি মনে হচ্ছে এক রুগ্ন অস্থি-চর্মসার কঙ্কাল স্বরূপ দেহকে ড্রাইভার আপন মনে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সযত্নে। শুধু তাই নয় গাড়িটির মধ্যে যেন সে এক মানব সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু গল্পটিতে বার বার যে 'নেম প্লেট ও তাতে সাদা অক্ষরে লেখা WBC-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মনে হয় গল্পের প্রকৃত অর্থ পাঠকের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে না।

গাড়িটির সম্পূর্ণ কলকব্জাকে ড্রাইভার নেড়েচেড়ে দেখছে কোথায় কোন গলদ বা কিভাবে গাড়িটির সম্পূর্ণ অবয়বকে পাল্টানো যায় শুধু নেম প্লেটটাকে বাদ দিয়ে। ধুলো থাকা সত্ত্বেও কেন গল্পকার এই জায়গাটুকুকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এই এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। কোন দিকটাকে গল্পকার আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আর কেনই বা 'নাম্বার প্লেটে রাশ রাশ ধুলো আসর জমিয়ে বসেছিল।' এই ধুলোটা কি ড্রাইভারের জীবনের অন্য এক দিকের প্রতি ইশারা দিচ্ছিল, আর যে দিকটায় ছিল শুধু 'দাও', 'পাঠাও' এই শব্দ। আর যেই ঘেরাটোপকে সে পাড়ি দিতে চাইছে কিন্তু পারছে না। আর এই ঘেরাটোপের চারপাশকে আকড়ে ধরেছিল 'বাবার চিঠি', 'মায়ের চিঠি', 'বৌর চিঠি' এমন কী 'ছোট্ট ছেলেটারও চিঠি'। চিঠিগুলোতে এমনকি লেখা ছিল যে ড্রাইভারের কাছে তা কখনো ভীষণ ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। গল্পের শেষ পর্যায়েও আমরা গল্পকারকে নাম্বার প্লেট পরিষ্কার করতে দেখিনি। আর না করলেও ওই নামেই কিন্তু চিঠিগুলো আসছে আবার সবাই নামটিও পড়ছে।

'খেলার ঘর' (কার্তিক ১৩৮০) গল্পটিতে গল্পকারের সৃষ্ট চরিত্র বিদ্যাসাগরের মুখে শেষ উক্তি

"...অদরকারী জীবটি আপনাদের মঙ্গল...মঙ্গলই করিবেন...।"

ভগবানকে 'অদরকারী জীব' হিসেবে গন্য করা কোন সাধারণ মানবাত্মার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন এই ব্যক্তির মুখে এমন নিরাশাপূর্ণ কটুক্তি। মঙ্গলময়ী ভগবানের প্রতি কেনইবা এরকম ব্যাঙ্গাত্মক অনুশোচনা? যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর সমস্ত জীবকুল টিকে আছে তাহলে কেন এই ভগবানের কাছে বিদ্যাসাগরের এরকম আক্ষেপ।

বিদ্যাসাগর কোন খেলার মাঠে কাকে উন্মোদের মতো খুঁজতে ব্যস্ত ছিল। আদৌ কি সে কোন খেলা দেখতে গিয়েছিল। নাকি আপনা আপনিই কোন খেলার মাঠের চিত্র নিজের মনের গভীরে এঁকে নিয়েছিল। খেলার মাঠের খেলোয়াড়দের পরিচয় কি ছিল। বাস্তবে কি সত্যিই তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল। আর যদি না-ই বা থাকতো তাহলে কোন মাঠের কোন ছাদের নীচে সে বসেছিল আর সেখানে বসে কোন সুন্দর-কুৎসিৎ খেলোয়াড়দের খেলা দেখছে। দেখতে দেখতে আবার বলছে যে ঐ খেলার নাম সে জানে না। নাম না জানা খেলা অথচ সেই মাঠে অসংখ্য দর্শকদের ভীড়। দর্শকদেরও আবার ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বাচ্চার এই চারটি জাত। প্রচন্ড হুলস্থূল কান্ড, প্রচন্ড চিৎকার। সবকিছুতেই যেন এক আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। অহরহ সিক্সার, বাউন্ডারী এই সবের আওয়াজ আসছে। কিন্তু খেলার নাম জানা নেই।

লেখক গল্পের প্রত্যেক স্তরেই একটি রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করে গেছেন। এক অন্তহীন মরিচীকার দিকে যেন ধাবিত হচ্ছিল বিদ্যাসাগর। কখনো বলছিল ঔষধ কিনতে গিয়ে Date of Expair কখনো বা দেখা যায় তার মা ও ছোটভাইকে খুঁজছে, আবার কখনো দেওয়াল ঘসে দাঁড়ানো শিষ্যটিকে দেখে তার নাম না জানা ছেলেটিকে মনে করে একটি পিতৃহৃদয় কেঁদে উঠতে। বিদ্যাসাগরের সব বিষয়েই দেখতে পাচ্ছি 'নেই' 'হারিয়ে যাচ্ছে'-এই রকম নিরাশাযুক্ত শব্দের আনাগোনাই বেশি।

যে ব্যক্তির নিকট নিজের স্ত্রীর স্মৃতিকে বিবর্ণ আর অসুখ আর মরা ঔষধকে সুবর্ণ লাগে তাকে আমরা কোন জগদের বাসিন্দা বলে স্বীকৃতি দিতে পারি। যে সর্বত্রই শুধু মৃত্যুকেই চোখে দেখতে পায়। 'মরা ঔষধ', 'মৃত শৈবাল', মায়ের জঠরে থাকা অবস্থায় পিতার মৃত্যু সংবাদ। মৃত্যুই খেলা চলছিল। কেননা 'নাম না জানা খেলা'। খেলোয়াড়রা নিজেদের

সঙ্গেই চাবুক নিয়ে খেলছে। একটা অসন্তোষজনক পরিবেশ। সে দেখতে পাচ্ছে যে তার মা ও ছোট ভাইয়ের বুকে ও পিঠে চাবুকের আঘাত কিন্তু সে তাদেরকে উদ্ধার করতে পারছিল না। এমন কি তার নিজেরও পেটে ও পিঠে ব্যথা হচ্ছিল। কেন সে তাদেরকে সেই অসন্তোষজনক খেলার মাঠ থেকে উদ্ধার করে আনতে সক্ষম ছিল না। কেন বিদ্যাসাগর তার হারিয়ে যাওয়া বা মৃত ছেলের প্রেতকে দেখে খুলিতে পুলকিত হয়ে উঠেছিল এবং সেই প্রেতকেই তার কাছে সুন্দর বলে মনে হচ্ছিল।

তাহলে লেখক কি কোন যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের হাতছানিতে বিদ্যাসাগরের চিন্তা চেতনাকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সর্বত্রই যেন এক নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা সমস্ত গল্পটিকে ঘিরে রেখেছে। যে ভাবনার সাহায্যে বিদ্যাসাগর এক আলৌলিকক স্বপ্নালোকের অন্তরালে নিজের বাস্তব জগৎকে খুঁজে বেরোচ্ছে। আবার এও বলতে পারি কয়েকজনের উপর তাঁর বাস্তবকে ফিরিয়ে দেবার দায়ভারও চাপিয়ে দিচ্ছে আর তাদের জন্য মঙ্গলকামনা করছে।

'ভিক্ষুক' (আষাঢ় ১৩৮০) গল্পটিতে এক পরাশ্রয়ী জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। শুধু ইঙ্গিত বললেই ভুল হবে এক প্রত্যক্ষে প্রমাণ দিয়েছেন, কেমন হয় পরাশ্রয়ীদের জীবন, তাদের চিন্তা ধারা, নীতি-নিয়ম। তাদের আশার কি কোন দাম থাকে? তাদের জীবনের মূল্য কি কেউ কখনো বুঝেছে বা বোঝার চেষ্টাও করে। নাকি এক জঞ্জালসম মনে করে আবর্জনার বাক্সে ঠেলে দিতে চায়। এই অনেকগলো প্রশ্নের অবতারণা করেছেন লেখক বিধু চরিত্রটির মাধ্যমে।

লেখক এই গল্পটিতে যে নয় বৎসরের বিধু চরিত্রটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার জীবনের করুণ পরিণতি আমরা পাঠকের হৃদয় ও মনকে মর্মাহত করে দেয়। এমন কি মনুষ্য জীবনকে মনে হয় ধীক্কার স্বরূপ। মনুষ্য জীবনের প্রতি ধীক্কার জানানো মানে জগদীশ্বরের কাছে এরকম প্রশ্নহীন জীবনের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা। এই বিধুকেও আমরা দেখতে পাই জড়বস্তুর মতো প্রতিদিন জানালার পাশে বসে চোখে জল নিয়ে নিজের মনের রোশকে অবদমিত করার চেষ্টা করে। কেননা যারা ক্ষমতাহীন বা যারা নিজে কোন কিছু করতে স্বাবলম্বী নয় তাদের কাছে একমাত্র সম্বল অশ্রুজল। গল্পটির প্রথম থেকে শেষ অবধি আমরা বিধুকে দেখতে পাই অশ্রুসিক্ত নয়নে। যদি কখনো বা হাসে তবুও সেই হাসির পেছনেও খেলা করে তার একাকীত্বের সঙ্গীনি 'কান্না'। কান্নাই ছিল তার নিত্যসঙ্গী। শুধু কান্নাই নয় প্রকৃতিও ছিল বিধুর প্রিয়জন, যার সাথে সে তার প্রতিদিনের আলাপচারিতায় ব্যস্ত থাকত। জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, আকাশের চোখে চোখ রেখে কি যেন বলতে থাকত। তবে মুখে নয় চোখে। কেননা ওর মুখের ভাষা কেউ সহ্য করতে পারত না। তাই বিধুর খেলাধুলা, রাগাভিমান সবকিছুই ছিল প্রকৃতির সাথে। মেঘের গর্জন ভয় করত সে। কিন্তু এখন অভ্যাসে পরিণত। বৃষ্টির জলের সঙ্গে তার ছিল ছেলেখেলা। কেন কখনো তো ছেলেবেলার জীবনের স্বাদ উপভোগ করতে পারেনি বিধু তাই। তার জীবনটা তো শুধু একটা মাত্র জানালা দিয়ে প্রকৃতির স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত ছিল। তার জীবনের যে ভগ্নদশা লেখক তার রচনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে সত্যিই কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ভগ্ন হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তিও যেন নতুন জীবনে নতুন আলোর আভা দেখতে পায় এই সত্যও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। বিধু যখন এই অসহায় শরীর নিয়ে দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আশাগুলো স্বপ্নের রূপ নিয়ে তাকে অন্য এক আলৌকিক জগতের যাত্রা করিয়ে আনে। সেখানে সে তার মৃত দাদাকে আবার নিজের মতো করে ফিরে পায়, তবে ক্ষনিকের জন্য। দাদার সঙ্গে বিধুর ক্ষণিকের আলাপচারিতায় লেখক এমন এক উন্মোক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন, যে পরিবেশটা বিধুর জগৎ ও জীবনকে অন্য এক মাত্রা দান করেছিল। ক্ষণিকের জন্য মনে হচ্ছিল আলৌকিক জগৎটাই যেন বিধুর আসল জগৎ যেখানে সে তার মা, দাদা ও বাবার আদর ও সোহাগে জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু পরাজগতে ক্ষণিকের স্বস্তিপূর্ণ ঠাঁইও যে বিধুকে আবার তার প্রকৃত সত্তার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। পরাজগতেও যেন বিধুর ঠাঁই নেই। এখানেও ধীক্কার, তিরষ্কার। সবাই অবহেলার পাত্র বলে মনে করে। এই জগতে কেউ কারো দায়ভার গ্রহণ করতে চায় না।

লেখক এই গল্পটিতে যে পরাজগতের সৃষ্টি করেছেন তাতে গল্পটির এক অন্য মানসিকতা প্রকাশ পায়। এত টানাপোড়েন, এত দ্বন্দ্বে ও সংঘাত যুক্ত জীবনের মধ্যেও যেন বিধু বাঁচার চেষ্টা করে। জীবনের স্বাদকে বোঝার জন্য

'ভিক্ষুকে'র ন্যায় শূন্য জীবনকে পূর্ণ করার প্রার্থনা করতে থাকে। আসলে ঐ বাঁচার চেষ্টা করাটাই হচ্ছে যারা বিধুকে একটা লাঞ্ছনার পাত্র মনে করেছিল তার শারীরিক দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে তাদের প্রতি একটা তীক্ষ্ণ প্রতিবাদের সূচনা।

'তদন্ত' (আশ্বিন ১৩৮১ বাংলা) গল্পটিতে বিধাতার রচিত এই পৃথিবীতে তার সৃষ্ট সব জীবের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। আর এই মানুষের এমন এক জনও নেই যে সে কৌতুহল প্রিয় নয়। সব সময় তার মধ্যে যে কোন বিষয় নিয়ে কৌতুহল প্রবণতা লেগেই থাকে। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা এই ক্ষমতা ছাড়া তো সে সব থেকে শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য শ্রেণীর তালিকাভুক্ত হতে পারবে না। আবার সেই কৌতূহলেরও যে দুটো দিক আছে তা গল্পকার এই গল্পটির মাধ্যমে খুব পরিষ্কারভাবেই পাঠকমহলের সামনে তুলে ধরেছেন।

এই গল্পটিতে গল্পকার নকুল চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে দিকটাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন তা সত্যিই এক শিহরণকারী, গা ছম ছম রূপী দৃশ্যকে যেন আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। গল্পকার নকুলের মধ্যে যে দুটো ব্যক্তি সত্তার জন্ম দিয়েছেন তাতে চরিত্রটি প্রতি আমাদের একটা কৌতূহল পরায়ণ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। গল্পটির শেষ পর্যায়ের যে অপ্রীতিকর দৃশ্য গল্পকার তার রচনায় স্থান দিয়েছেন, সেই দৃশ্য দেখার পর গল্পকারের উদ্দেশ্যে আমরা পাঠকমহলের অনেক জবাবদিহি থাকতেই পারে। কেন এরকম পরিণতি হল ঊনিশ বছরের নকুলের যে নাকি ভূগোল পড়তে ভালোবাসত। এই বিশ্ব চরাচরের কোথায় কি গোপনীয় আছে তার আনাচে কানাচে খুঁজে দেখার চেষ্টা করত, এই জীবন সম্বন্ধে বা চাওয়া পাওয়া নিয়ে যার এত ঔৎসুক্য সে কি পারে তার জীবনকে এমন এক নিরাশাময়, কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে। বা গল্পকার কোন উদ্দেশ্যে নকুলের জীবনের এক প্রশ্নাচিহ্নময় অবসান করেছেন। তাহলে একটু অভিমান হয় গল্পকারের প্রতি।

নকুল চরিত্রটির মধ্যে গল্পকার যে দুটি সত্তার জন্ম দিয়েছেন তাতে একটি জায়গা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, নকুল এমন একটি পথের খোঁজে এগিয়ে গিয়েছিল যে সেখানে সে তার প্রকৃত জীবনবোধকে বুঝতে পেরেছিল। গল্পের প্রথম দিকে আমরা যে নকুলের সঙ্গে পরিচয় হই তার স্বভাবে উচ্ছনতা ও একঘেয়েমি একটা লক্ষণ থাকলেও কোথাও যেন এর মধ্য দিয়েও তার মধ্যে একটা নতুনত্বকে খুঁজে পাবার বাসনা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নতুনত্ব বললেও বিষয়টা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় না কারণ নকুলের জীবনের শেষের যে পরিণতি হয়। সেই ভয়ানক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে আবার কীসের নতুনত্বকে খুঁজে পাবে।

গল্পের প্রথমে নকুলকে বন্ধুদের প্রতি আড্ডায় মত্ত এবং পরিবারের প্রতি বিরক্তিকর মনোভাব সম্পন্ন দেখা যায়। মায়ের 'হিসেব' চাওয়াতে রাগ করা, বাবার প্রতি তার তো সব সময়েই এক বিক্ষুব্ধ মনোভাব, বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে- 'শালী তোমার বাপের পয়সা খাচ্ছি বসে বসে'-আর তার কটুক্তির প্রতিবাদে দাদা তার গালে চড় মারলে নকুলও সম্পর্কের মর্যাদা ভুলে গিয়ে তার কোমরের বেল্ট খুলে চাবুক চালায় দাদার মুখে। গোটা চরিত্রটাই যেন এক তাচ্ছিল্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে সমস্ত গল্প জুড়ে। কিন্তু দাদার সঙ্গে এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর নকুল আর আড্ডায় গিয়েও শান্তি পাচ্ছে না, যেন কেউ বলছে নকুলের দিকে আঙুল তুলে। আর নকুল তা সহ্য করতে পারছে না। নিজের প্রতি নিজের যেন ধিক্কার জন্মে যায়। এমতাবস্থায় নকুলকে আর সপ্তাহ খানিকের জন্য তার বাড়িতে দেখা যায় না। কেননা সে বাড়িতে গিয়ে দাদাকে তার মুখ দেখাতে পারবে না তার মায়ের কান্নায় ভরা চোখ গুলি দেখতে পারবে না। তাই মহেশের ওখানে গিয়ে উঠল। আর সেখান থেকেই গল্পকার নকুল চরিত্রের মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা করেন। এমনকি জিতু যখন তার বৌদি সম্পর্কে অশ্লীল উচ্চারণ করে তখন নকুল 'নাক মুখ থেঁতলে দেবে শ্লা কুত্তার বাচ্চা' এই কথা বলে জিতুর প্রতিবাদ করে। নকুলের এই উক্তিই তার মানসিক পরিবর্তনের সব থেকে বড়ো উদাহরণ। আর এই পর্যায় থেকেই নকুলের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই যেন এক একটি পরিবর্তনের উদাহরণস্বরূপ।

যে বাবার সামনে অল্প সময়া থাকা তো দূরের কথা উনার কথা শোনাটাও যার কাছে বিরক্তিকর ছিল সেই নকুলকে তার মা 'তুই একটু বাইরে যা নকুল। ওঁর কষ্ট হচ্ছে' সেই নকুলকে কথা বলেও যেন ঘর থেকে বের হতে কষ্ট পেতে দেখি। এই কষ্টটাই কি নকুলের ভেতরকার উচ্ছৃঙ্খল, হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য ও মায়াদয়াহীন নকুলকে এমন এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এক সপ্তাহ পরে লুকিয়ে ঘরে আসা সেখানে এসে বাবার কঁকানো কণ্ঠস্বর, মাকে বাবার পায়ে

ধরে কাদতে দেখো-এইসব মর্মান্তিক দৃশ্যই কি নকুলের অন্তরাত্মাকে ভেঙে চুড়ে এক অভাবনীয় পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয় নকুলের শেষ বারের মতো ঘর থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় সে তার বাবার যে স্নেহ-মমতা ভরা করুণ পিতৃহৃদয়ের পরিচয় পায় সেই পরিচয়ও যেন তার হৃদয়ে এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট ভাবের উন্মেষ করে। আর এই ভাব ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই নতুন জীবন ফিরে পায় নকুল সেই পুরাতন বেমানান জীবনের আহুতি দিয়ে।

এই ক্ষেত্রে বলা যায় গল্পকার নকুলের জীবনের যে করুণ পরিণতি ঘটিয়েছেন সেটা বাহ্যিক ছন্নছাড়া এক জীবনের সমাপ্তি আর সেখান থেকেই আর একটি নতুন জীবনের আরম্ভ। তাহলে গল্পকার মৃত্যুকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এক নতুন পরাণের সঞ্চার করেছেন। আর সেই দিক দিয়ে বিচার করলে গল্পকার আমাদের সামনে এক পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নকুলকে উপস্থাপন করেছেন।

'আপতকালীন' (অগ্রহায়ণ, ১৩৮১) নামটিতেই যেন ধ্বংস, বিধ্বস্ততার হাতছানি। সর্বত্রই হাহাকার দুর্যোগের সম্ভবনা। কোথাও যেন শান্তি নেই। সবাই যেন নীতি নিয়মকে ভেঙ্গে শুধু আপন ব্যক্তিত্ব নিয়েই চিন্তিত। নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চালিয়ে যাচ্ছে জীবন সংগ্রাম। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আকাল, দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ, অনাহার, অর্ধাহার ইত্যাদি যেন গল্পটিকে চতুর্দিক থেকে গ্রাস করে রেখেছে। এসবকে এড়িয়ে গল্পটির কোন চরিত্রই যেন বের হতে পারছে না। প্রত্যেকটি চরিত্রের অর্ন্তমন যেন এই কয়েকটি বিধ্বস্ততার শিকার। মৃত্যুর বুভুক্ষু দৃষ্টি থেকে সবকটি চরিত্রই যেন প্রত্যেকের ভিতরকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলছে। কিন্তু এই ভয় থেকে কি মুক্তি পাওয়া যাবে? বা কে মুক্তি দেবে?

গল্পটিতে যেন এক প্রেতপুরীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন গল্পকার। তাঁর কাছে রচনার প্রত্যেক মানব চরিত্রই যেন প্রেতাত্মাসম। সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে অকাল বৈশাখীর মেঘের ন্যায় অন্ধকার, আর শুধুই অন্ধকার। সেই নগরীতে যেন আলোর প্রবেশ নিষেধ। যেন কোন এক দৈত্যসম পুরুষ যমকালো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে সেই নগরীর দ্বার রক্ষক হয়ে। কোথাও বাঁচার কোন আশা নেই শুধু এখ যন্ত্রণাক্লিষ্ট নিরাশা যেন সবাইকে কোন এক পথে নিয়ে যেতে চায় দুহাতে শিকল পরিয়ে খাদ্যের লড়াইয়ে পরাজিত সৈনিকের ন্যায়।

এই গল্পটিতে গল্পকার যে আগাম যুদ্ধের আভাস দিয়েছেন সেই যুদ্ধ আসলে কোন যুদ্ধ। স্বদেশকে বাঁচানোর যুদ্ধ নাকি 'জীবন যুদ্ধ'। এই 'যুদ্ধ' শব্দটির মধ্য দিয়েই গল্পকার গল্পটির প্রকৃত অর্থের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন বা এর মধ্যেই গল্পটির প্রকৃত অর্থ লুকিয়ে ছিল।

গল্পটির আনাচে-কানাচে 'উপোস' শব্দটি যেন এক ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তির ন্যায় বেচে বেড়াচ্ছে। আর এই শব্দটিই তাদের ভয়ের প্রধান কারণ। বিশেষ করে সরলার স্বামী নলিনীর। এই শব্দটি যেন তার হৃদয়ে বিষের ন্যায় আঘাত করে। এমনকী মৃণ্ময়ী যখন সবার জন্য সমানভাবে ফ্যানভাতের থালা সাজায় তখন নলিনী এক পলকের মধ্যে নিজের পাত পরিষ্কার করে অন্যের পাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে না পারলেও সরলার দৃষ্টি কিন্তু নলিনীর এই ক্ষুধা আর পিপাসাকে আকড়ে ধরে। এবং নিজের পাতের সম্বলটুকুও নলিনীর পাতে সাজিয়ে দেয়। সরলা যে এরপর অনাহারে বা অর্ধাহারে থাকবে এই চরম সত্যটুকু নলিনীর অজানা ছিল না তথাপিও সে নিজের উদরের জ্বালায় এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে সরলার ক্ষুধার্ত মুখখানি তাঁর সেই বুভুক্ষু হৃদয়কে আটকাতে পারেনি।

গল্পকার গল্পটিতে এমন এক বিধ্বস্তরূপী নৃশংস পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন যেখানে মানুষ তো খুব দূরের কথা একটি কুকুর পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের শিকার হতে রক্ষে পায়নি। সেই কুকুরটি নাকি শেষ পর্যন্ত বিল্বের বমিকেই আস্বাদ মনে করে স্বযত্নে খেতে ব্যস্ত হয়। গল্পের এই দৃশ্যটি যেন সত্যই এক শিহরণকারী পরিবেশকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। ক্ষুধার তাড়না প্রত্যেকটি চরিত্রকেই যেন প্রাণহীন জড়বস্তুর মতো অচেতনতার দিকে এমনভাবে ঠেলে দিচ্ছিল যে সেখান থেকে ফিরে আসার পথ একেবারেই রুদ্ধ, আর তার প্রমাণ দিপুর ছল ছল করা দুটো চোখ। প্রত্যেকটি চরিত্রই যেন বোবা প্রকৃতির। কিছু বলার, কিছু করার ক্ষেমতাহীন এক একটি ব্যক্তি সত্তা। এমনকি কুকুরটিও।

গল্পটি সর্বত্রই যেন এক অসহ্যনীয় জ্বালা-যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ। যে যন্ত্রণার ঘেরাটোপে প্রত্যেকটি চরিত্রই বন্দি। সেই বন্দি গৃহ থেকে গল্পটির শেষ পর্যায়ে গল্পকার দরজার মধ্যে যে কয়েকটি 'ঠক-ঠক-ঠক' ঠোকার উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে

কি প্রত্যেকটি চরিত্রকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া কোন ইশারা? নাকি প্রত্যেকটি চরিত্রই শুধু মৃত্যু কামনা করছে পেট পুরে খাবারের স্বপ্ন দেখে দেখে।

এখানে গল্পকার নলিনীর মধ্য দিয়ে এক অকাল গ্রাসী অনাহারী সত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এবার অন্যদিকে গল্পকার যে 'বস্তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাকে অনন্তকাল ধরে এহাত-ওহাত করতে দেখিয়েছেন এতে শোষক ও শোষিত এই দুটো শ্রেণির দিকে যেন গল্পকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কারণ এত উপোস, অনাহার এমনকি একটি নির্বাক জীবও একজন মানবিক সত্তার ন্যায় বর্তমানের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিল্বের 'বমিকেই' তার বাঁচার একমাত্র উপকরণ মনে করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। এখানে 'বস্তা ভর্ত্তি রেশনে'র উল্লেখ গল্পকার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করেছেন। এতে 'একদলকে তলায় না রেখে অপর দল যে উপরে উঠতে পারে না' এই চিরন্তন সত্যকেই যেন হার মানিয়ে দিচ্ছে। একদল এতই উপরে উঠে গেছে যে অপর দলকে খুঁজে পাবার মতো সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

'জোড়াশালিক' (চৈত্র ১৩৮১) গল্পটি গল্পকারের এমন একটি রচনা যেখানে গল্পকার বনমালী আর তার ছোট এই দুটো চরিত্রকে যেন একটি সত্তায় পরিণত করে দিতে চেয়েছেন। গল্পটিতে এক অন্য রকমের চরিত্র নির্মাণ করেছেন গল্পকার দুটো চরিত্রেরই চাল চলন, কথা-বার্তা, ভাব-ভঙ্গী সব কিছুই যেন আলাদা রকমের তবুও কোথাও যেন গল্পকার এই চিরাচরিত বন্ধন সূত্রের আভাস দিয়েছেন। আর সেই আভাসই যেন দুটো চরিত্রের সম্পর্কের বন্ধনকে একটি পর্যায়ে এনে শিথিল করে দেয়। যে বন্ধনটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে আমরা বনমালীকে প্রথম থেকেই দেখি। কিন্তু সে একটি শক্ত সামর্থ স্তম্ভের ন্যায় বন্ধনটির সঙ্গে টিকে থাকতে যেন নড়-বড়ে হয়ে যাচ্ছে। এমনকি তার বউ পারুলের শরীর খারাপ হওয়া সত্ত্বেও জোড় খাটিয়ে ছোট ভাই সতুকে ঘরে থাকার জন্য বলতে যেন এক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হচ্ছিল। এই দ্বন্দ্বটা কি পারুলের তিন তিনবার মরা বাচ্চা হয়েছে এর জন্য না কি আদৌ এই দুটো চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কের ছিন্ন ছিল।

যে চরিত্রটিকে আমরা নিজের বৌদি সম্পর্কে এমন তাচ্ছিল্যকর মন্তব্য করতে দেখি যে-'বাচ্চা বিয়োবে তোমার বউ তো আমার কি'। এমন বিরক্তিকর, মায়া মমতাহীন উক্তি করতে যে ব্যক্তি দ্বিধাবোধ করেনি বা যে চরিত্র 'হবে না কিস্সু। বাচ্চা মরলেও বউ মরবে না' এই ধরনের উচ্চারণ করতে পারে তার কাছে 'সম্পর্ক' বলতে কোন ধরনের শব্দের জন্য এতটুকুও যে জায়গা ছিল না এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই চরিত্রটির মধ্যেও যে লেখক আপন মহিমায় মনুষ্যত্বের, দয়া-মায়ার, করুণার সোনালি রং ভরে দিতে পেরেছিলেন এটা স্বাভাবিক। হঠাৎ করে যেন এই পাথরসম ব্যক্তির হৃদয়কে নেমে থাকা কোন এক ঝড় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে যায় আর জন্ম সম্পর্কের কোন এক নতুন সত্তার।

সতুর মুখ থেকে এরকম উক্তি সত্যিই যেন সবাইকে অবাক করে দেয়। তাহলে লেখক যে 'জোড়াশালিক'কে গল্পের অন্তর্লীনে রেখে গল্পটির মূল উদ্দেশ্যকে খুঁজতে বেড়িয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্যটা পারুলের পাশে শুয়ে থাকা জীবন্ত নাগরিক আর টিউকলের জলে শরীরের সব তাপ ধুয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা নতুন সতুর আগমনে সফল হলে উঠেছে।

'ফেরারী' (বৈশাখ ১৩৮২) গল্পটি লেখকের আরেকটি অনবদ্য সৃষ্টি। আমাদের জীবনে সবারই একটা উদ্দেশ্য থাকে বা এও বলা হয় সবই যেন একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলে। উদ্দেশ্যবিহীন জীবনের নাকি কোনো মানে নেই। তবে গল্পকার কেন সৈকতের জীবনকে এমন উদ্দেশ্যবিহীন করে তুলেছিলেন। কিন্তু একেবারে যে আবার উদ্দেশ্যহীন একথা বললেও ঠিক হবে না। কারণ সৈকতকে আমরা দেখি প্রকৃতি সম্বন্ধে সে বড় সচেতন। সে নিজের অন্তরের চাপা ভাবনাকে প্রকৃতির অঙ্গ ভঙ্গির মাধ্যমে যেন ব্যক্ত করেছে সমস্ত গল্প জুড়েই। প্রকৃতি যেন তার কাছে এক জীবন্ত ব্যক্তি সত্তায় পরিণত হয় প্রতি মূহূর্তে।

গল্পকার সৈকত এবং নীলুর সম্পর্কের যে রূপরেখা আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাতে যেন একটা দীর্ঘ তফাতের পরিচয় পাই আমরা। দুজনই কিন্তু দুজনকে নিয়ে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অবসাদগ্রস্ত মানসিকতার স্বীকার, তবুও নিজের মনের সেই ছাইচাপা আগুনকে তুলে ধরেননি। তাদের দুজনার সম্পর্কে একটা অনুভব, একটা আকর্ষণের আভাস পাই আমরা। কিন্তু সম্পর্কটার কোনো নাম দেওয়া, একটা ভীষণ ব্যাপার আমরা পাঠকের কাছে। কেননা তাদের সম্পর্কের সর্বত্রই যেন একটা চাপা রুদ্ধশ্বাস বিরাজ করছিল। একটা টানটান আবহাওয়া তাদের চতুর্দিককে বেষ্টিত করে রেখেছিল। যদিও তাদের মনের গভীরতায় এক অন্য ধরনের দোলাচলাতা ছিল। আর গল্পকার নিজেও এই কথায় একমত।

নীলুর চরিত্রের এই দিকটা সত্যই আমাদেরকেও একটু ভাবনায় ফেলে। দুজনের মধ্যে এত আলাপচারিতা, এত দোষ-ক্রটি বের করা। মনে হয় খুব কাছের লোক। তবুও এই যেন একটা নিস্তব্ধতা তাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করত। কিছু প্রকাশ করার ইচ্ছে থাকলেও ওরা সেটা চেপে যেত। এক্ষেত্রে মনে হয় এদের সম্পর্কেরও যেন কোনা লক্ষ্য ছিল না। শুধু নদীর ধারার মত বয়ে চলেছে। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ জানেনা। তাহলে লেখক নামকরণের সার্থকতার জন্য এমন একটা অস্বস্তিকর বা অর্থহীন পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন, নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল।

যদি গল্পের নামকরণ নিয়ে কথা বলি তবে সেক্ষেত্রে সৈকতের চরিত্রকে গল্পকার সঠিক মাত্রা দিয়েছিলেন। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গল্পের শুরু থেকে শেষ অবধি গল্পকার সৈকতের চরিত্রকে আমাদের সামনে যেভাবে ঠিকানাবিহীন একটি পাখি মুক্ত আকাশে আপন মনে উড়ে বেড়াতে থাকে ঠিক সেভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু গল্পের শেষ লাইনটি এ বিষয়ে আমাদরে মনে একটু খটকা জাগায়, এভাবে-

"ঐ মোহনপুরের মাঠ পেরোলেই জোড়া
শালিখের দেখা মিলে।"

এই একটি উক্তিতেই লেখক গল্পের মোড় পালটে নিয়ে গল্পটিকে এক অন্যমাত্রা দান করেছিলেন। আসলে লেখক হয়তো সৈকতের এই উদ্দেশ্যবিহীন যাত্রার মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনের প্রকৃত স্বাদকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আর যদি তাই না হত তবে যখনই প্রমথের মুখে নীলুর বিষয়ে শুনতে পেল- "শী ইজ সিক্রেটলি ম্যারেড' এর পরমুহূর্তেই শাঁওলী নাম্নী আট-নয় বছরের মেয়েটির মূখাবয়বকে লক্ষ্য করে তার নাম ধূপছায়া রাখত না। তাও আবার নির্জন প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে। আসলে হয়তো এতদিন পর তেপান্তরে হাটতে হাটতে সে জীবন সম্পর্কে একটু সজ্ঞান হয়েছিল। আর সজ্ঞানতার প্রাপ্তিকে বা তার অন্তদ্বর্ন্দ্বের সমাপ্তিকে সে চিৎকার করে বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। যেন মনে হচ্ছে প্রকৃতির অশেষ দানই যেন সৈকতের উদ্দেশ্যকে সঠিক মাত্রা দিয়েছিল। আর তাই আমরা সৈকতকে দেখি 'আমি চলে গেলে তোর কি হবে রে' নীলুর সেই আশ্বাসহীন শব্দগুলোতে সে যেন এক বিরাট স্বস্তি ও আশ্বাস খুঁজে পায় এবং নিজে নিজেই বলে ওঠে 'কিসসুনা' 'কিসসু হবেনা'। আর এই উক্তিতেই গল্পের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা পাঠক অবগত হই।

এই গল্পটিতে আমরা সৈকতকে দেখি এমন ভবঘুরে অবস্থায়। যেখানে তাকে শুধু নির্জনতার সামনা করতে হয়। সুন্দর আকাশ-পাতাস, মনোরম প্রকৃতিকে নিয়েই তার যাত্রা আরম্ভ করেছিল আর এই প্রকৃতির এক নতুন পথের সন্ধানেই তার যাত্রা এগিয়ে গিয়েছিল। গল্পকার তার লেখনীর কৌশলের দ্বারা সৈকতের চরিত্রকে এমনভাবে একটা উদ্দেশ্যমূলক দিশার পথে চালিত করেছিলেন যে পথে চলতে চলতে সে যেন নতুন একটা জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। লেখক গল্পটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে গল্পটিতে যে গোপনীয়তা রেখেছিলেন সেই গোপনীয়তা যেন ধীরে ধীরে সৈকত চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রকাশ পায়। এবং লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আমরা অবহিত হই। আর এখানেই গল্পকারের চরম শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়।

'আসন্ন বিকেলের শেষে' (আশ্বিন ১৩৮২) গল্পটিতে যে চরিত্রগুলির অবতারণা আমাদের সামনে করেছেন এই সবগুলি চরিত্রই যেন এক অবসাদ ক্লান্তিতে ভুগছে। এক যন্ত্রণাময় চিৎকার যেন সম্পূর্ণ গল্পটিতে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এক বুক ফাটা দুঃখ যে দুঃখ কে সবগুলি চরিত্রই যেন আপন সঙ্গী করে রেখেছে। নিজেদের অন্তরাত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেছে সেই দুঃখ। এক মর্মবেদনার দীর্ঘশ্বাস প্রত্যেকটি চরিত্রের আশেপাশে যেন চিরন্তন সত্যের মতো প্রবাহমান। আর এই প্রবাহমানতার স্রোতে সবগুলি চরিত্রই যেন এক ঠিকানাহীন হয়ে পাড়ি দেয়।

গল্পটির প্রতিটি স্তরেই যেন এক বেদনা-হতাশা কাজ করে চলেছে। তাহলে লেখক কোন উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে শুধু দুঃখ-বেদনা-হতাশা-ক্লান্তিকে সর্ব প্রথম স্থান দিয়েছেন। এই হতাশা মগ্ন নিরাশার পেছনেও কি কোন আশার আলো গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন।

পীরু চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এক প্রেমিক হৃদয়, যে নাকি প্রেমকে বিকশিত করতে পারছে না তার নিত্যসঙ্গী ব্যাধির কারণে। কিন্তু তার মনের গহনে অনবরত চলতে থাকে রূপসীর সাথে তার প্রেমের সেই স্মৃতিগুলি। গল্পকার যদিও সমস্ত গল্পটিতে এক নিরাশার হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন তবুও রূপসীর মনে পীরুকে সুস্থ করে তোলার

জন্য ঠাকুরবাড়িতে তার মানস যেন গল্পটিতে এক টুকরো আশার আলো ঠিকরে দিয়েছিলেন। কথায়ই আছে-'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে'। এই কথাটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা রূপসীর চরিত্রে দেখতে পাই। যে রূপসী মৃত্যু পথ যাত্রী পীরুকেই তার সবকিছু মনে করে তার সঙ্গে এক নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু রূপসীর সেই স্বপ্ন কি সার্থক হয়েছিল?

রূপসীর বাবা চিদানন্দ পেশায় কম্পাউন্ডার। এই চরিত্রটিকে লেখক গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রের আশেপাশে এক হাড়ভাঙা খুঁটির ন্যায় দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। যার আওতায় তার আইবুড়ো দুটো মেয়ে, নেশাগ্রস্ত একগুঁয়ে প্রকৃতির বয়স্ক একটি ছেলে থাকলেও বয়সের চাপ ও অকেজো মনোভাব তাকে তাদের প্রতি বাবার অধিকার থেকে সবসময়ই বিরত রাখে। সে রূপসীর লুকিয়ে চোখের জল ফেলা, রূপসীর মতো আইবুড়ো মেয়ের কামনা-বাসনা, চিন্ময়ের দিনের পর দিন নেশাগ্রস্ত হয়ে ঘরে ফেরা সব কিছুই লক্ষ্য করত কিন্তু মুখ খুলে কাউকে কিছু বলার সাহস পেত না। একটা অকর্মণ্য মূর্তির ন্যায় শুধু সবকিছুর হিসেব রাখত। যে হিসেবটা ভাগাভাগি করার জন্য তার মৃত স্ত্রী সরমাকে নিজের অন্তরে বাস্তব রূপ দিত। আর প্রত্যেক দিন একটা ঠিকানাবিহীন চিঠির মধ্যে তার সংসারের ভাঙনের একটা রূপরেখা এঁকে দিত। যে ভাঙন রোধের কোনো উপায় তার কাঁপতে থাকা হাতে ছিল না। সে একজন পঙ্গু দারোয়ানের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছুর পরখ করতে থাকে। পরিস্থিতির চাপ চিদানন্দকে এতই দুর্বল করে দিয়েছিল, যে দুর্বলতা সে বয়সের চাপ বলে নিজেকে সান্তনা দিতে থাকে আর তা না হলে ছেলে চিন্ময়ের বাবা সম্পর্কে এমন মন্তব্যটা আমরা পাঠককেও ভাবতে জোর দেয় 'শ্লা বাপ হয়ে তুমি শাসন করতে পারলে না...'।

চিন্ময়ের এই উক্তিটিই যেন চিদানন্দ চরিত্রটিকে আমাদের সামনে পরিষ্কারভাব ফুটিয়ে তুলেছে। চিন্ময় চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখতে পাই জীবন সম্পর্কে উদাসীন প্রকৃতির এক ব্যক্তি সত্তাকে। কিন্তু তার অন্তরেও যে এক সুখের নীল সংসারের স্বপ্নালু জগৎ দোলা দেয় তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। তার চোখও দেখছে-'একটা বাড়ি, কয়েকটা মানুষ, আর কিছু সুখ, কিছু দুঃখ। সে তার এই স্বপ্নালু জগৎকে বাস্তবায়িত করার জন্য ভাগ্য নামে একটি পাষাণ হৃদয়ী ব্যক্তির কাছে আকুল আবেদন করছে। সে খুঁজতে থাকে তার সেই সুন্দর ফুটফুটে সংসারকে কিন্তু কোনো সর্বগ্রাসী থাবা যেন তার এই সু-স্বপ্নকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যক্তি সত্তার মধ্যে আমরা আইবুড়ো দুটো বোন সম্পর্কে চিন্তাশীল একটা ভাইয়ের হৃদয়কে উঁকি দিতে দেখি কিন্তু এই চিন্তার মধ্যেও সহায় সম্বলহীন অসহায়তার ছাপ। কিন্তু করতে না পারার এক বেদনাময় ধিক্কার।

গল্পকার প্রত্যেকটি চরিত্রেকে একটা আশাহীন ঘেরাটোপে বন্দী রেখেছিলেন যদিও তবুও প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যেই যে চাওয়া-পাওয়ার, কামনা-বাসনার একটা আশাময় ছায়া বিরাজ করছে তা আমাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। আর তার জ্বলন্ত উদাহরণ সরসী। যে সরসী তার কামনাকে চেপে রাখতে না পেরে তার ভাই চিন্ময়ের 'পুরুষ ঠোঁটে' চুমু খায়। কী ভীবৎস এক দৃশ্যের সম্মুখীন করালেন লেখক। সাধারণভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সরসী যেন প্রকৃতির নীতি-নিয়মকে লঙ্ঘন না করে তাকেই অনুসরণ করে চলেছে। একটি আইবুড়ো বা বিয়ের হিসেবে পুরো বুড়ো মেয়ের কি কোনো আত্মচাহিদা থাকতে পারে না। কুৎসিৎ বলে কি সমাজে তার কোনো আশ্রয় নেই। কেন তাকে অবহেলার পাত্র মনে করে দূরে ঠেলে রাখা হয়। তার জন্য কেন নিজেকে এক আলাদা জগতের রচনা করতে হয়। নিজের আত্মতৃপ্ততার কি কোন অবকাশ নেই সরসীর মতো আইবুড়ো মেয়েদের। এই প্রেক্ষিতে লেখকের কাছে আমরা পাঠকের একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন যে সরসী কি সত্যই কোন ভুল করেছে? তবে আমরা যদি এই ব্যাপারে চিন্ময়কে কেন্দ্র বিন্দুতে রাখি তাহলে সরসীকে আমাদের একটু দোষী বলে মনে হয়। আর যদি এখানে চিন্ময় ছাড়া অন্য এক পর পুরুষের উল্লেখ থাকত তাহলে তো সরসীকে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো মোটেই চলে না। এখানে আমরা এক চিরকালীন কামনা পিপাসু নারী হৃদয়ের পরিচয় পাই। আর এটাই স্বাভাবিক।

গল্পটির সর্বশেষে আমরা পরিস্থিতির কবলে ব্যর্থ এক ব্যক্তি সত্তার মধ্যে নিজের মেয়ের জন্য এক সুন্দর-সুস্থ-সাবলীল জীবনযাপনের কামনা করা পিতৃহৃদয়ের পরিচয় পাই। যে পীরুর জীবনের শেষ মুহূর্তে তার শরীরের ঔষধের সিরিঞ্জ ঢোকাতে গিয়ে এই সত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়।

যে পীরুকে বাবা হিসেবে রূপসীর যোগ্য মনে করেনি তার ঘরে আসার পর ক্ষণিকের জন্য চিদানন্দ রূপসীর বৈবাহিক জীবনের এক সুন্দর স্বপ্ন দেখে ফেলে। যেখানে চিদানন্দ টিকটিকির কাটা লেজটাকে মেয়ে রূপসীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার কাছে রূপসী যেন এই বিলীন হয়ে যাওয়া শীর্ণ দেহের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছিল আর পারছিল না এই লোক দেখানো সংসারের ঘানি টানতে। যে রূপসীর জন্য চিদানন্দ প্রত্যহ মৃত পত্নী সরমার কাছে তাকে এই দুঃখ যন্ত্রণাময় সংসারের ছোবল থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাত। মনে আজ তার এই আবেদনটা টিকটিকির মৃত লেজটার কথা বলতে গিয়েও বলতে পারেনি যেই লেজটাকে চিদানন্দ মেয়ে রূপসীর সঙ্গে তুলনা করেছিল। রূপসী যেন পীরুর সঙ্গে কাটা লেজ হয়ে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল আর তাই চিদানন্দ নিজের পিতৃ হৃদয়ের তৃপ্তির জন্যই বোধহয় মৃত লেজটার কথা বলতে গিয়েও বলতে পারেনি তার গ.লার স্বর যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

শব্দের প্রতিচ্ছবি (ফাল্গুন ১৩৮২) গল্পটিতে গল্পকার আমাদের জীবনের কয়েকটি বাস্তব সত্যের সঙ্গে পরিচয় করাতে চেয়েছিলেন। 'শব্দের প্রতিচ্ছবি' নামটিতেই যেন কোন সত্যের সন্ধান করছিলেন গল্পকার। প্রথমত দেখতে হবে গল্পকার কোন প্রকৃত ছবিকে অনুসন্ধান করেছেন? বা সত্যের পথে হাঁটছেন। কারণ ছবি যদি নাই থাকে তাহলে প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কঠিন হবে। ঠিক যেভাবে ধ্বনি যদি না হয় তবে প্রতিধ্বনিও হওয়া অসম্ভব। কারণ দুটোই একে অপরের পরিপূরক। আর পরিপূরক মানেই তো এক জন অন্য জনের উপর নির্ভরশীল। তাহলে গল্পকার এই 'প্রতিচ্ছবি' শব্দটির মধ্য দিয়ে কোন জীবন সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। ছবি ছাড়া যেভাবে প্রতিচ্ছবির কোন মানেই নেই। এখানে এই প্রতিচ্ছবির অন্তরালে গল্পকার আসলে কোন কিছুকে অনুসরণ করার কথা বলতে চেয়েছেন। যে চরিত্রটিকে গল্পকার আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তার মধ্যে আমরা এক প্রকারের কাল্পনিকতার ছাপ লক্ষ্যে করি বা এও বলা যায় যেন কোন কল্পনা জগতের বাসিন্দা। সব কিছুতেই যেন তার অল্প-স্বল্প ঔদাসীনতার ধোয়াশা আর যারা কল্পনা নিয়ে খেলা করে বা সব কিছুর মধ্যে কল্পনাকেই আশ্রয় করে ঘুরে বেড়াই সে আবার রোমান্টিকতাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। যে দেশলাইকে সার্কাসে নাচিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারে তাকে রোমান্টিক না বলাটাও ভুল হবে। লেখকের প্রত্যেকটি শব্দে রোমান্টিকতার হাওয়া বইছে। আকাশের মেঘ ঝরছে না, ঝরবে, হালকা-হালকা ঠান্ডা বাতাস। শব্দগুলির গভীরতায় প্রবেশ করলে নিজেকে যেন কোন এক রূপকথার নায়ক বলে মনে হয়। যেন মনে হয় কোন এক প্রেমিক তার প্রেমিকার জন্য অপেক্ষায় রত কিন্তু আসছে না; 'মেঘ ঝরছে না, ঝরবে'। আর এই হালকা বাতাস যেন শেই অপেক্ষামান প্রেমিকের হৃদয়কে আরও চাঞ্চল্যে ভরে দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বিখ্যাত রোমান্টিক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যখন বৃষ্টি নামল' কবিতাটির দুটি লাইন মনে পড়ে-

> "... কিন্তু তুমি নেই বাহিরে অন্তরে মেঘ করে
> ভরী ব্যাপক বৃষ্টি যেন বুকের মধ্যে ঝরে।"

লেখকের রোমান্টিক হৃদয় পৃথিবীকে দূরের দেশ বলে মনে করে যখনই তিনি ট্রেনে চাপেন। এই ধরনের ভাবনা-চিন্তা একমাত্র একজন রোমান্টিক ব্যক্তি সত্তাই করতে পারে। তাঁর পক্ষেই সম্ভব জড় বস্তুর মধ্যেও প্রাণের সঞ্চার করতে। লেখক নিমেষের মধ্যেই দেশলাইয়ের মতো প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে সার্কাসে নাচালেন কিন্তু যে সোঁ সোঁ শব্দের ব্যবহার লেখক করেছেন ঝর হবে বলে। সেই শব্দটা আসলে কীসের শব্দ। শুধু শব্দটাই হচ্ছে কিন্তু ঝর হচ্ছে না। আসলে এই ঝরটা কি লেখকের রোমান্টিক মনেরই কোনো 'প্রতিচ্ছবি' নাকি বাস্তবেও কোনো ঝর হয়েছিল।

লেখকের এই রচনার প্রত্যেকটি পর্যায়েই রোমান্টিকতা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। লেখক এতই রোমান্টিক ছিলেন যে ইলেকট্রিক ওয়ারটিকেও তিনি একটি জীবিত প্রাণীর রগ বলে কল্পনা করেন। ভাবলেও একটু বিস্মিত হতে হয়। কেননা যে লেখক 'ক্রমশ তাপ', 'শ্বেত রক্ত কণা', 'ভিক্ষুক', 'আপাৎকালীন' ইত্যাদি গল্পে দুঃখ বেদনা হতাশা-ক্লান্তি-অবসাদ গ্রস্ত জীবনের এমনই করুণ ছবি এঁকেছিলেন যে তাঁর রোমান্টিকতা এভাবে সর্বত্র আছড়ে পড়ছে দেখে অবাক লাগে।

এমনকি একটি অজানা শিশুর কান্নার, খেলাচ্ছলে ভদ্রলোকের দেশলাই তোলা, ফ্লুরোসেন্টের তিনবার দপদপ্ শদ করে জ্বলা এই সবকিছুতেই যেন রোমান্টিকতার সহিত এক সরলতারও পরিচয় দিয়ে গেছেন।

কিন্তু হঠাৎ করে এই রোমান্টিক আর সরলতার স্তর পেরিয়ে লেখক এই চিন্টু নামের শিশুটির মধ্য দিয়ে কোন আক্রোশকে প্রকাশ্যে আনার চেষ্টা করেছিলেন। যে আক্রোশটা মনে হয় লেখকের অনেক দিনের চাপা এবং যার অবসান তিনি চিন্টুর ঢিল মেরে মাছিকে মারার মধ্য দিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই আক্রোশের অবসান কি হয়েছিল। কারণ মাছি তো মরেনি বরং কাচের টুকরোর সশব্দ চারিদিকে নেচে উঠেছিল।

এই গল্পের গল্পকারকে আমরা নিজের মধ্যেই কয়েকটি চরিত্রের অবতারণা করতে দেখি। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক নামের চরিত্রটাকে সামনে রেখে গল্পের সমস্ত চাবিকাঠি লেখক নিজের হাতেই রেখেছিলেন। কেননা গল্পটিতে কখনো লেখকের রচনার মাধ্যমে তাকে ভীষণ রোমান্টিক, কখনো আবার রোমান্টিকতাকে চেপে রাখার এক অস্পষ্ট ভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ তার কল্পিত কোন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লেখকের সৃষ্ট ভদ্রলোক বিমনা হওয়া সত্বেও তাকে প্রেম বলে স্বীকৃত দিতে নারাজ কেন। আবার সেই ভদ্রলোকেরই গল্পের অসুস্থ নায়িকার মুখ দিয়ে 'ঠিকই, ভালবাসার বড় বেশি কারুকাজ।' এ ধরনের উক্তি তো একজন রোমান্টিক ভাবনা সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহলে লেখক এই ভদ্রলোকটির চরিত্রের মধ্য দিয়ে কোন ব্যক্তি সত্তাকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যেন এক চাপা ভাব লেখক এই ভদ্রলোকটির চরিত্রের কোন এক কোনে অস্পষ্টভাবে স্থান দিয়েছিলেন। যে দিকটাকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা ভদ্রলোকের ছিল না। গল্পটিতে লেখক যেন এক রোমান্টিক সত্তার মধ্য দিয়েও শেষ পর্যন্ত ক্লান্তির একটু আভাস দিয়েছিলেন ভদ্রলোকের 'বাকি ক'টা দিন না হয় বিশ্রামই করবো'- এই উক্তিটির মাধ্যমে।

'ডায়নাসোরের ফুসফুস' (অগ্রহায়ণ ১৩৮৫) গল্পটির মধ্য দিয়ে লেখক জীবনের দুটো দিককে আমাদের সামনে খুব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। যার মধ্যে একটা দিক হচ্ছে শান্ত, স্নিগ্ধ, স্বস্তি ও রোমান্টিকতায় ভরপুর আর অপর দিকটার রূপ হচ্ছে ভীষণ ভয়ঙ্কর। ভাবলে গা ছমছম করে ওঠে। এক অস্বস্তিকর শিহরণ জাগে মনের মধ্যে। মানুষের জীবনের এমন দুটো রূপকে গল্পকার তাঁর লেখনীর মাধ্যমে স্পষ্টতর করতে চেয়েছেন সে দুটো দিক সম্পর্কে আমরা সবই প্রায় অবগত। কিন্তু এই গল্পের কাহিনিতে যে চরিত্রগুলোর সমাবেশ লেখক করেছেন এবং এদের দ্বারা মানব সমাজের যে দুটো শ্রেণীর রূপরেখাকে বাস্তবতার আলোয় প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেখানেই গল্পকারের অনবদ্যতা অস্বীকার করা যায় না।

রতীশ আর পূরবী এই দুটো চরিত্রের মধ্যে গল্পকার প্রথম থেকেই এক আকাশ পাতাল ফারাক রেখেছেন। রতীশের মধ্যে আমরা একজন মানবদরদী, পর দুঃখে কাতর হৃদয়ের পরিচয় পাই। তার চরিত্রের কোনায় কোনায় লেখক বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এমনই ওয়াকিবহাল পুরুষের ছবি এঁকেছেন যে ভোর সোয়া চারটায় নরম বিছানা ছেড়ে ওঠে তার গোপন সৌখিনতার সামগ্রী বাইনোকিউলার দিয়ে ব্যালকনি থেকে নিচের বস্তির তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকর শৃগাল-কুকুর সম জীবনযাপন করতে ব্যস্ত লোকগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। তার চোখ থেকে যেন এদের জীবন সংগ্রামের কোন দৃশ্যই এড়িয়ে যেতে পারেনি। সব দৃশ্যই যেন তার ঐ সামগ্রটিতে বন্দী। ওদের জীবন যে প্রতিটি ক্ষণে সমাজের শ্রেণী বিভাজনের ঘেরাটোপে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে সেখান থেকে বাঁচার তাগিদে এক শব্দহীন আবেদন করে যাচ্ছে কিন্তু তাদের এই আবেদন শোনার মতো ধৈর্য বিলাসবহুল জীবনযাপনকারী পূরবীদের মতো কারো নেই। পূরবী এমন একটি চরিত্র যার মধ্যে আমরা আপন জগৎ নিয়ে ব্যস্ত এমন এক মানসিকতার ছাপ পাই। লেখক সমস্ত গল্প জুড়েই পূরবীকে চিন্তা-ভাবনাহীন এমন একটা জগতের বাসিন্দা করে রেখেছেন যেখানে নেই কোনো জীবন যুদ্ধ, নেই কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নেই জীবন বাঁচার কোনো টানাপোড়েন। তার জীবনের সর্বত্রই যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শান্তি, জীবনের পূর্ণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভরা নীল আভা। যে আভায় পূরবী তার স্বামী রতীশকে নিয়ে জীবনের সব আনন্দ উপভোগ করছে। পূরবীর চরিত্রে আমরা রোমান্টিকতার এক অপরূপ চিত্র দেখতে পাই। প্রকৃতি প্রেমিক রতীশ ও পূরবী দুজনেই। কিন্তু যে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রতীশ প্রকৃতির সৌন্দর্যতার সাথে সাথে নিচের বস্তির লোকজনদের জীবন সংগ্রামকেও অগ্রাহ্য করতে পারছে না ঠিক তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে পূরবী সেই বস্তির লোকজনদের বাঁচার জন্য লড়াইকে একটা মনোরঞ্জনের বা উপভোগের জিনিষের সঙ্গে তুলনা করছে। পূরবীকে বলতে দেখি 'লিভিংস্ট্রাগল' ভালো লাগার বিষয়। আর রুণিমাকে ঘুরতে আসার জন্য বলবে তাদের ঘর সংসারকে দেখার জন্য। পূরবীর এই কথায় একটি বিষয় পরিষ্কার যে তার কাছে তার ঘর-সংসার

ছাড়া আর কিছু দেখার মতো নেই। জীবনের সব চাওয়া পাওয়া যেন সে তার মুঠোয় বন্দী করে রেখেছে। সে যেন জীবনের একটা দিককেই মানে যেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট-নিরাশা-হতাশা নেই সেই দিককেই পরম তৃপ্তি বা জীবনের শেষ পর্যায় বলে মেনে নিয়েছে এবং সেটাকেই আপন করে রেখেছে। আর সে কারণেই শুধু রতীশের চোখেই ধরা পড়ে সেই অবহেলিত, লাঞ্ছিত প্রাণীগুলির খাদ্যের জন্য মারামারি-চিৎকার আবার সেই খাদ্যে কুকুর ও কাকের মতো জীবের অংশীদারী। সবাই যেন বাঁচার জন্য জন্ম থেকেই শুধু 'স্ট্রাগল' করে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই স্ট্রাগলের অন্ধকারময় ঘেরাটোপ থেকে এরা কখনো মুক্তি পাবে না। আবার এই অন্ধকারের মধ্যে রতীশ দেখতে পায় এক নিঃস্ব রিক্ত রিক্সাওয়ালার বুকেও যে কামনার উদ্রেক হতে পারে। এত ঝড় জঞ্ঝার মধ্যেও লেখক তাদের মনে রোমান্টিকতার দোলা জাগিয়ে ছিলেন তা আমাদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। লেখক সমস্ত গল্প জুড়ে রতীশকে এই নিচু তলার বস্তির লোকদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু শক্ত সামর্থ প্রতিনিধি হিসেবে নয়। কেননা রতীশের মধ্যে আমরা একজন দুর্বল ভীরু পুরুষকে দেখতে পাই। চাপা একটা ভয় যা সে মন খুলে প্রকাশ করতে পারছে না। বস্তির ঘটনাগুলো প্রত্যহ নিরীক্ষণ করছে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। রুণিমাকে ভালোবাসে কিন্তু এত এম্বিশাশ মেয়েকে বিয়ে করবে কি করে? সব কিছুতেই ওর যেন একটা চাপা স্বভাবের বা মুখ বুঝে সহ্য করার অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়।

'শতক্রতু' পত্রিকার এই দু'জন গল্পকারের গল্পের আলোচনা করে আমরা আসলে বরাক উপত্যকার গল্পচর্চার ইতিহাসকে আরও গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করলাম মাত্র। আশা করি, ইতিহাসের এই পর্ব পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী, বিশ্বতোষ, বরাক উপত্যকায় বাংলা কথাসাহিত্য, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, দ্বি-ষষ্ঠীতম অধিবেশন, ১৩৯৬, পৃ. ৩১
২. আহমেদ ওয়াকিল : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, প্রতিভা : স্বাতন্ত্র্য বিচার, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ৫, জুলাই, ৮৭ পৃ. ১২
৩. গুপ্ত শিবানী : 'কর্ডলেস', করিমগঞ্জ, ২০০৬, পৃ. ২৭
৪. চক্রবর্তী জগন্নাথ : 'ছাতাচুড়া আর বড়াইলের গল্প' বিদ্যাসাগর জ্ঞানভারতী, হাফলং, আসাম, জুলাই, ২০০৫, পৃ. ৪
৫. চক্রবর্তী তাপস : 'চক্রবাক', শিলচর, কাছাড়, ১৫ জুন, ১৯৯৫, পৃ. ৫৮
৬. চক্রবর্তী, ভবানী : 'ঈশান বাংলার গল্প (সম্পাদনা)', শিলচর, কাছাড়, ২০০১, পৃ. ২৪